পর্যটন বিচিত্রা

অক্টোবর ২০২২

পড়তে পড়তে গন্তব্যে...

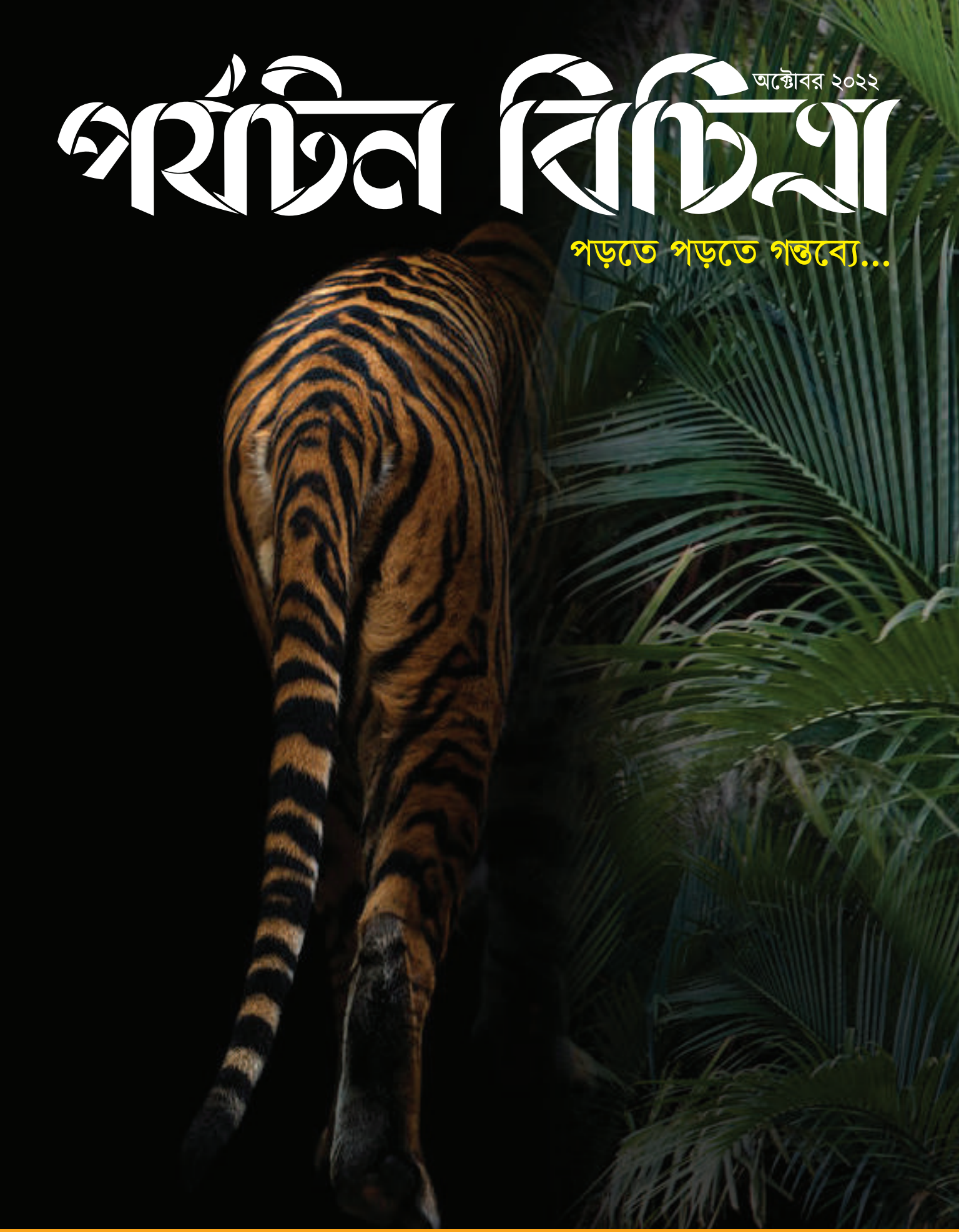

www.parjatanbichitra.com

Green Holidays

Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition | Sightseeing | Transport
Corporate Event | Corporate Training | Documentary | Guide & logistics
Education / Medical / Migration Consultancy

Dubai

Thailand

Malaysia

Singapore

Turkey

Nepal

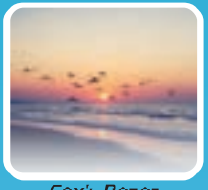
Cox's Bazar

Sundarban

Bandarban

Sajek

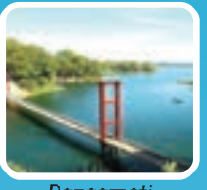
Rangamati

Sylhet

দেশ ভ্রমণ

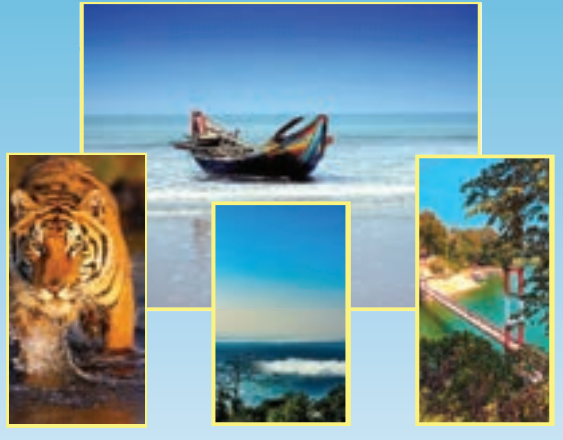

বিদেশ ভ্রমণ

House-97/1, Flat-2B, Road-Sukrabad, Dhaka-1207, Bangladesh
Hotline: +88 01730450099, +880 1552 555550
E-mail: visa.ght@gmail.com, Web: www.greenholidaysbd.com

VISA | AIR TICKET | HOTEL | PACKAGE TOUR | CRUISE

সূচিপত্র

ভ্রমণের অনন্য গন্তব্য সুন্দরবন	৫-৮
ট্রাভেল টিপস: ই-পাসপোর্ট পাবেন যেভাবে	১০-১১
বান্দরবান	১২
দেশে বেড়ানো: রাঙামাটির কোথায় ঘুরবেন	১৩-১৪
বিউটি বোর্ডিং: ইতিহাসের নস্টালজিয়া	১৫-১৬
টাঙ্গুয়ার হাওড় ভ্রমণ সহায়িকা	১৭-১৮
সাগর সৈকতে কুয়াকাটা	১৯
ট্রাভেল টিপস: বাঞ্জি জাম্পিংয়ের পূর্ব প্রস্তুতি	২০
চাঁদপুরের মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্র মেঘনার তীরে সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি	২১-২২
পর্যটন উৎসব: লোকউৎসবের 'ভদ্র-আশ্বিন'	২৩-২৪
আমার অহং ভাঙার বাহন	২৬
ঐতিহ্যের নৌভ্রমণ	২৭-৩১
ফটো অ্যালবাম (ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ)	৩২-৩৩
পর্যটন বিকাশের অপার সম্ভাবনা 'জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর'	৩৪-৩৫
দ্য ল্যান্ড অব কুইন	৩৬
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার খুলছে পর্যটনের দুয়ার	৩৭-৩৮
স্মৃতিচারণ: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্তিম সান্নিধ্য ও কিছু স্মৃতি	৩৯
রানী এলিজাবেথের বুড়িগঙ্গায় নৌবিহার	৪১
বর্ণিল আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত	৪২
'বেস্ট ডমেস্টিক এয়ারলাইন' অ্যাওয়ার্ড পেল ইউএস-বাংলা	৪৩
কাছের দেশে বেড়ানো: কলকাতা	৪৪-৪৫
দার্জিলিং	৪৬-৪৭
মেঘালয়: একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা	৪৮-৪৯
সিকিম	৫০
ভ্রমণ নিয়ে শেকসপিয়ারের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি	৫১
অ্যাডভেঞ্চার বজ্র ড্রাগনের দেশে টাইগার নেস্ট অভিযান	৫৩-৫৫
হিমালয়ের দেশ নেপাল	৫৬-৫৭
বিদেশে বেড়ানো: দ্বিচক্রযানে রুয়ান্ডায়	৫৯-৬০
পর্যটনে নতুন ভাবনা টেকসই উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা	৬২

সম্পাদকীয়

পর্যটন শিল্পের পেশাজীবীদের কাছে বিশ্ব পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর) আলাদাভাবে গুরুত্ব বহন করে। প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বিশ্বব্যাপী 'Rethinking Tourism' (নতুন ভাবনায় পর্যটন) শীর্ষক শিরোনামে দিবসটি উদযাপন করেছে। এই থিমের বক্তব্যে পর্যটন শিল্পের বাণিজ্যিক বিষয়বস্তুর বাইরে একটি সামগ্রিক উন্নয়নে পর্যটনের গুরুত্বের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়নে পর্যটন, স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরিতে পর্যটন ও গ্রামীণ অর্থনীনিতে পর্যটনের ভূমিকা আলোচ্য বিষয়।

কোভিড পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর পর্যটনখাত পুনরুদ্ধারে নতুন ভাবনায় পর্যটন শিল্পকে সাজাতে হবে। ভাবতে হবে নতুনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র, একই সাথে জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছে, টেকনোলজির ব্যবহার বেড়েছে, হাতের মুঠোয় সকলের সেবা পৌঁছেছে, ব্যবসায় মধ্যমাদের দৌরাত্ম্য কমতে শুরু করেছে, সেবা গ্রহীতা ও দানকারীর মধ্যে অর্থাৎ পণ্য ও ক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ টেকসই হতে শুরু করেছে। এসব বিবেচনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। ফলে ব্যবসার ধরনও পাল্টাতে শুরু করেছে। কিছু পেশার অবলুপ্তি আবার নতুন পেশার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই নতুন ভাবনায় পর্যটন শিল্পকে সাজাতে হবে। এই ইঙ্গিতই রয়েছে এ বছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল আলোচ্য বিষয়ে।

প্রতিবছরের মতো কোভিড পরবর্তীতে এবারও **পর্যটন বিচিত্রার** আয়োজনে ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও অনেক নতুনত্বের সূচনা হয়েছে। মেলায় ৮ দেশের ১৩০টি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রায় ৫০টির বেশি বিদেশি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পর্যটন বাজারের প্রতি বিদেশিদের আগ্রহ বেড়েছে; বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর পর্যটন গন্তব্যে বহুমাত্রিকতা ও পরিকল্পিত পর্যটন পণ্যের কারণে। এবারের মেলায় বাংলাদেশেরও নতুন গন্তব্যে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলের হাউজবোট, রাঙামাটির হাউজবোট ও শ্রীমঙ্গলের প্রান্তিক পণ্যের প্রতি পর্যটকের আকর্ষণ বেড়েছে। একই সাথে দেশের বড় বড় তারকাখচিত হোটেলগুলো স্থানীয় বাজার ধরার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। নতুনভাবে আঞ্চলিক পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনমঞ্চে পরিণত হতে চলেছে।

সেই সাথে বাংলাদেশের গর্ব, বাঙালির অহংকার পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে অদম্য উচ্চতায় পৌঁছিয়েছে। দক্ষিণের সাথে মসৃণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। কুয়াকাটা, সুন্দরবন, ভোলার চরাঞ্চল, রিভার ট্যুরিজম ও কোস্টাল ট্যুরিজম নতুনভাবে পর্যটনের সম্ভানাকে উন্মোচন করেছে। এখন দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। তবেই পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে শুরু করবে।

সম্পাদক
মহিউদ্দিন হেলাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ঝর্ণা মহিউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মীর শামছুল আলম বাবু

গবেষণা বিভাগ
মো. জামিউল আহমেদ
মোফাজ্জাল হোসেন
জিয়াউল হক হাওলাদার
ড. মো. আতাউর রহমান

বাণিজ্য সম্পাদক
বোরহান উদ্দিন

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক
জায়েদ খান খালেদ

বাণিজ্যিক নির্বাহী
মেহেদী হাসান

শিল্প নির্দেশক
নাজির খান খোকন

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. খোকন মিয়া
মো. আবু বক্কর সিদ্দিক

বিদেশ প্রতিনিধি
আশরাফুজ্জামান উজ্জল

সম্পাদকীয় কার্যালয়

বাণিজ্যিক কার্যালয় :
বাড়ি ৯৭/১, ১ম তলা (২,বি)
শুক্রাবাদ, ঢাকা-১২০৭।

ফোন : +৮৮০২-২২২২৪২৯৪৪
ইমেইল : info@parjatanbichitra.com
ওয়েব : www.parjatanbichitra.com

নিবন্ধিত কার্যালয় :
এমআর সেন্টার (৭ম তলা) বাড়ী-৫/৯
রোড-১৭ বনানী বা/এ ঢাকা-১২১৩
বাংলাদেশ।

Endorsed by

You are invited to join

asian Tourism FAIR

Connecting Regional Tourism

THE BIGGEST EVER TOURISM EXPO IN BANGLADESH

9th ASIAN TOURISM FAIR

Sept. 29-30 & Oct. 01, 2022

Exhibition Open (10:00 AM - 07:00 PM)

International Convention City Bashundhara (ICCB)
Dhaka, Bangladesh

Endorsed by | Supported by | Organized by

Prime Partner Country: nepal | Partner Country: THAILAND | Host Country

Feature Country: Incredible India | TOURISM MALAYSIA | Sri Lanka | Lithuania

Airlines Partner: Biman Bangladesh Airlines | Hospitality Partner: INTERCONTINENTAL

Adventure Dining Partner | Cruise Partner | Entertainment Partner | Transport Partner

www.asiantourismfair.com

ভ্রমণের অনন্য গন্তব্য সুন্দরবন

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বা প্যারাবন আমাদের এই সুন্দরবন। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রল হরিণের আবাস্থল এ বনে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে বেঁচে থাকার দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র রক্ষাকবচ সুন্দরবনের মতো এমন অন্যন্য সবুজ প্রাচীর বেষ্টনী পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়

সুন্দরবনের বেড়ে ওঠা

সুন্দরবনের গঠন প্রক্রিয়া চলে প্রকৃতির আপন বিন্যাসে। এখানে বনায়নের জন্য মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না। সারা পৃথিবীর কমপক্ষে ৫০টি ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ৪০টিরও বেশি সুন্দরবনে রয়েছে এবং এসব উদ্ভিদ কোনো নতুন দ্বীপখণ্ডে একসঙ্গে গজায় না। একটি প্রজাতির পর আরেকটি প্রজাতির শ্রেণি বিন্যাস মেনে ক্রমে ক্রমে একটি নতুন দ্বীপকে গভীর বনাঞ্চলে রূপান্তরিত করে তোলে। বাদাবনের এই গঠন প্রণালীকে বলা হয় 'সাকসেশন প্রসেস'।

নতুন চরে প্রথম লোনা ঘাস ধানি, ঘাস, মুথা ঘাস, ছন ঘাস এবং সঙ্গে বেড়ে ওঠে হোগলা, হরগোজা কাঁটা, কেয়া কাঁটা, হুদোবন, বুনো ঝাউ ইত্যাদি। এরপর আগমন ঘটে কেওড়া, গোলপাতা এবং ধানশী মেলোবনের মতো আচ্ছাদন ও লতাগুল্মের ঝোপঝাড়।

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় গেওয়া, গরান, কাঁকড়া, ধুন্দুল, গর্জন, আমুল, বাইন, সিঙড়া, হেতাল, বলা কেরপা, খলসি, ঝানা, ওড়া ইত্যাদি লবণাম্বু বৃক্ষপ্রজাতি। পশুর ও সুন্দরী গাছের আগমন ঘটে সবার শেষে। সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বনের উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, জলজপ্রাণী, কীটপতঙ্গ সবকিছু একান্তভাবে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলে রয়েছে এক অপূর্ব বৈচিত্র্যময় সামঞ্জস্য।

সুন্দরবনসংলগ্ন সাগরের বুকে জেগে ওঠা কোনো নতুন দ্বীপে প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার স্রোত বয়ে উদ্ভিদের আগমন ঘটে তেমনি সেই নির্জন বনানীতে যথাসময়ে বন্যপ্রাণীদের আগমন ঘটে প্রাকৃতিক বিন্যাসেই।

বাদাবনের উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণিজগতের রয়েছে গভীর ও অন্তঃবাহী সম্পর্ক।

বাদাবনের বৃক্ষশ্রেণির বেড়ে ওঠা ও বিন্যাস এতটাই শৃঙ্খলপূর্ণ এবং তাল মানলয়ে এতটাই ছন্দবদ্ধ যে, এর নৈসর্গিক দৃশ্য যে কোনো মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণিজগৎ আমাদের এক বিশাল ভূখণ্ডের উৎকর্ষ সাধন করে একান্ত নীরবে ক্রমাগ্রত এগিয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে।

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী

সুন্দরবনে এখনো বন্যপাণী চিত্রল হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, শূকর, বানরসহ ৪৯ ধরনের স্তন্যপায়ী, ৫৩ ধরনের সরীসৃপ, ১৪০ ধরনের স্থায়ী পাখি, ৩১৫ ধরনের অতিথি পাখিসহ ১২০ ধরনের মৎস্য সম্পদ ও ২০ হাজার রকমের কীটপতঙ্গ এবং কোটি কোটি মৌমাছির আবাস্থল।

কোথায় বেড়াবেন

সুন্দরবন ভ্রমণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্পট হলো- কটকা, কচিখালী, হিরণ পয়েন্ট, কোকিলমনি, তাম্বুলবুনিয়া, হাড়বাড়িয়া, করমজল। এছাড়া সুন্দরবন প্রবেশদ্বার থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকু দৃশ্যই আপনাকে মনোমুগ্ধ করে রাখবে এক নিবিড় আনন্দে।

কীভাবে যাবেন

রহস্য-রোমাঞ্চে ঘেরা ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের বেশির ভাগ ট্যুর শুরু হয় খুলনা থেকে। ঢাকা থেকেও ট্যুর রয়েছে। ঢাকা থেকে যাত্রার সুবিধা হচ্ছে, আপনাকে আলাদা করে বাসে খুলনা যেতে হচ্ছে না, বরং ঢাকা থেকেই জাহাজে যাত্রা শুরু করা যায়। সামর্থ্য অনুযায়ী পর্যটকেরা ভ্রমণ করতে পারেন সুন্দরবন। সাধারণত খুলনা থেকে ৩ দিন ২ রাতের কিংবা ৪ দিন ৩ রাতের ভ্রমণ প্যাকেজ হয়। ঢাকা থেকে ৫ দিন ৪ রাতের প্যাকেজ রয়েছে। বিলাসবহুল লঞ্চ রয়েছে সুন্দরবন ভ্রমণে। ঢাকার মতিঝিল, আরামবাগ, শ্যামলী, কল্যাণপুর, গাবতলী থেকে গ্রিনলাইন, সোহাগ, হানিফ, ঈগল, একে ট্রাভেলসসহ বিভিন্ন এসি/ননএসি বাস খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যায় সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। এছাড়া সায়দাবাদ থেকে টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস, ফাল্গুনী পরিবহণ, সুন্দরবন, পর্যটক, বনফুলসহ বিভিন্ন

সুন্দরবন ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য ট্যুর অপারেটর

রিভার অ্যান্ড গ্রিন ট্যুরস (ফোন-০১৯৭০০০৪৪৪৭), দি বেঙ্গল ট্যুরস লিমিটেড (ফোন-০১৭১৩০৩১৭৫৪), সিলভার ওয়েভ ট্যুরস (ফোন-০১৭১৩৪৫২১৩৯), গ্রিন হলিডেজ (ফোন-০১৭৩০৪৫০০৯৯), পাগমার্ক ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস (ফোন-০১৭১৫১৬৭৭৪০), হলিডেজ শিপিং লাইন্স (ফোন-০১৭১১৩৭৭৫৩৬)।

বাস খুলনা, বাগেরহাট ও মোংলার উদ্দেশে ছেড়ে যায় সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। খুলনায় ট্রেনে এবং যশোর পর্যন্ত বিমানে যাওয়া যাবে। পাশাপাশি নৌপথেও আসা যায়। খুলনায় নেমে লোকাল বাসে বাগেরহাট, মোংলা যাওয়া যাবে। বর্তমানে পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে বাসে সরাসরি খুলনায় ৪ ঘণ্টা ও মোংলায় ৪ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়।

মোংলা থেকে করমজল লঞ্চ বা ট্রলারে মাত্র ৪৫ মিনিটের পথ হওয়ায় দিনে যেয়ে দিনে ফিরে আসার সুবিধা রয়েছে। এছাড়া ভ্রমণে তুলনামূলক খরচও কম। খুলনার বিআইডব্লিউটিএ লঞ্চঘাট বা জেলখানা ঘাট থেকেও সুন্দরবন যাওয়া যায়। এছাড়া মোংলা লঞ্চঘাট থেকে নিয়মিত ছোট ছোট লঞ্চ যাতায়াত করে হাড়বাড়িয়া ইকো পর্যটনকেন্দ্র পর্যন্ত।

মোংলা থেকে লঞ্চে ৩/৪ দিনের জন্য দিনের জন্য কটকা, হিরণ পয়েন্ট কিংবা দুবলার চর বেড়িয়ে আসতে পারেন। এই পথে সুন্দরবন প্রবেশের মুখে ঢাংমারী ফরেস্ট স্টেশন থেকেই সুন্দরবন শুরু। স্রোতের গতিবেগে লঞ্চ প্রবেশ করতে থাকবে গহীন অরণ্যে, চোখ যে দিকেই ফেরান শুধু শুধু সবুজের একাকার। কটকা অভয়ারণ্যে যেতে ৭/৮ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে মোংলা থেকে।

সুন্দরবন ভ্রমণে প্রস্তুতি

সুন্দরবন প্রবেশের আগে অবশ্যই বাগেরহাটে অবস্থিত বন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বনে প্রবেশের অনুমতিপত্র নিতে হবে। সুন্দরবন ভ্রমণের পুরো সময়টা আপনাকে জলযানেই কাটাতে হবে এবং রাত্রিযাপন জলযানেই করতে হবে। আপনি ইচ্ছা করলে মংলা থেকে সুন্দরবনে প্রবেশ না করে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর দিয়েও প্রবেশ করতে পারেন অথবা সুপাতি/শরণখোলা দিয়ে চুলকুরি নলিয়ান রেঞ্জ অফিস হয়ে যেতে পারেন। সুন্দরবন ভ্রমণের আয়োজন বেশ ঝক্কি ঝামেলার। সেক্ষেত্রে সুন্দরবন ভ্রমণের পুরো দায়িত্ব আপনি পেশাদার ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে আসুন। বেশকিছু বেসরকারি ট্যুর অপারেটর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুন্দরবন ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। আপনার পক্ষ থেকে এরাই অনুমতিপত্রসহ সবকিছুর অগ্রিম ব্যবস্থা করে দেবে।

খুলনা ও মোংলায় রয়েছে এমন শতাধিক ট্যুর অপারেটর। ঢাকাতেও আছে। মংলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরশনের রয়েছে পশুর নামে একটি মোটেল। সুন্দরবন যাত্রার অন্তত এক সপ্তাহ আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে বন বিভাগ থেকে যাত্রার অনুমতি নিতে হয়। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি কোনো ট্যুর অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্তত ৩০ দিন আগে আপনার যাত্রা নিশ্চিত করতে পারলে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন ভ্রমণতরী ও খরচ

এমএল বাওয়ালী: সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ছোট্ট আধুনিক একটি ভ্রমণতরী। পাগমার্ক ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলসের মালিকানাধীন এ লঞ্চ ১২ থেকে ১৬ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরনে ঘুরে বেড়ায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লঞ্চটিতে পর্যটকদের জন্য আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এ কোম্পানির আরেকটি ভ্রমণতরী এমএল মাওয়ালী ৫ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে যায়। এ দুটি নৌযানে ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ খরচ জনপ্রতি ১৬ থেকে ২৭ হাজার টাকা।

এমভি ভেলা: সুন্দরবন ভ্রমণে দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকদের সেবা দিয়ে আসছে এমভি ভেলা। ২৬ জন পর্যটক নিয়ে নিয়মিত সুন্দরবনে যায় দ্য বেঙ্গল ট্যুরস লিমিটেডের এ নৌযান।

এমভি ভেলার ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে খরচ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

এমভি কোকিলমনি: সিলভারওয়েভ ট্যুরসের নিজস্ব ভ্রমণতরী এমভি কোকিলমনি। ৩২ জন পর্যটককে নিয়ে এ নৌযান নিয়মিত সুন্দরবনে যায়। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে জনপ্রতি ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা খরচ।

এমভি বন সাম্পান: পপুলার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রেড এবং বনজীবী ট্যুরসের যৌথ পরিচালনায় এ বছরের শুরুতের দিকে যাত্রা শুরু করেছে নৌযানটি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক এ নৌযান ৪০ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে যায়। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে জনপ্রতি খরচ ১২ হাজার ৫০০ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

সি পার্ল ক্রুজ: এমভি সি পার্ল ক্রুজ-৩ ও সি পার্ল ক্রুজ-৪ নৌযান দুটি দিয়ে সুন্দরবনে ট্যুর আয়োজন করে রয়্যাল টিউলিপ সি পার্লের সহযোগী কোম্পানি সি পার্ল ক্রুজ। ৫২ ও ৪৬ জন পর্যটক ধারণ ক্ষমতার এ নৌযান দুটিতে ২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজে খরচ ১০ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।

এমভি দ্য ওয়েভ: এ নৌযানটি দিয়ে সুন্দরবনে নিয়মিত ট্যুর পরিচালনা করে হলিডেজ শিপিং লাইন্স। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক এ নৌযানের ধারণ ক্ষমতা ৭৬ জন। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে জনপ্রতি লাগবে ১৮ হাজার টাকা।

দ্য সেইল: সুন্দরবনের আধুনিক একটি পর্যটক নৌযান দ্য সেইল। এ জাহাজটি সর্বোচ্চ ৪৮ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে যায়। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে খরচ ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

এমএল উৎসব: শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ নৌযান ৪০ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে যেতে পারে। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে খরচ জনপ্রতি ১২ হাজার ৫০০ থেকে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা।

এমভি সানওয়ে: ৪৮ জন পর্যটক ধারণ ক্ষমতার এ নৌযানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আছে। ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে খরচ হয় ১৩ হাজার থেকে ১৭ হাজার টাকা।

এমভি অবসর: সুন্দরবনে আধুনিক পর্যটক বাহনের যাত্রা শুরু হয়েছিল এ নৌযানের সঙ্গেই। তখন মালিক ছিল দ্য গাইড ট্যুরস লিমিটেড, পরে মালিকানা বদলায়। কয়েক দফা সংস্কার করে বর্তমানে এর ধারণ ক্ষমতা ৫৪ জন। এ নৌযানে ২ রাত ৩ দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে খরচ জনপ্রতি ৯ থেকে ১১ হাজার টাকা।

এমএল সুবতি: একবারে ৩২ জন পর্যটককে নিয়ে সুন্দরবনে যেতে পারে এমএল সুবতি। সাধারণত ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায় ৩ দিন ২ রাতের ভ্রমণ প্যাকেজে এ নৌযানে সুন্দরবনে যাওয়া যায়।

এমএল মাছরাঙ্গা: ২০ জন ধারণ ক্ষমতার এ নৌযানে সুন্দরবনে ২ রাত ৩ দিন বেড়াতে খরচ ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা।

এমভি ভেসপার: এ নৌযান ৬৬ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে যেতে পারে। ২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজে খরচ ৮ হাজার ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা।

এমভি জিলান: ৭৫ জন ধারণ ক্ষমতার এ নৌযানে ২ রাত ৩ দিন সুন্দরবনে বেড়াতে ৮ হাজার ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ পড়বে।

সার্ভিস লঞ্চ: বিশেষভাবে তৈরি নৌযানগুলোর বাইরেও প্রতিবছর ভ্রমণ মৌসুমে বেশ কিছু লঞ্চ পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনে ট্যুর পরিচালনা করে। বছরের অন্যান্য সময় খুলনা থেকে বিভিন্ন রুটে যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী এসব লঞ্চ ভাড়া নিয়ে স্থানীয় কিছু ট্যুর অপারেটর কম খরচে পর্যটকদের বেড়াতে নিয়ে যায়। এসব নৌযানে সুযোগ সুবিধার কিছু ঘাটতি থাকলেও ভ্রমণে খরচ তুলনামূলকভাবে কম। এসব সার্ভিস লঞ্চে ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকায় ৩ দিন ২ রাত সুন্দরবন ভ্রমণ করা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে এ লঞ্চের ভালো চাহিদা রয়েছে।

উপরোল্লিখিত এসব ভ্রমণতরীর বিভিন্ন প্যাকেজের খরচের হিসাব ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগের। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন ভ্রমণে রাজস্ব বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বন বিভাগ। আগে সুন্দরবনের সাধারণ জায়গাগুলোতে মাথাপিছু দেশি পর্যটকের ভ্রমণ ফি ছিল প্রতিদিনের জন্য ৭০ টাকা, সেটা এখন বেড়ে হয়েছে ১৫০ টাকা। এসব জায়গায় বিদেশি পর্যটকের আগে খরচ হত প্রতিদিন ১০০০ টাকা, এখন তা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। সুন্দরবনের ভেতরে কটকা, কচিখালী, নীলকমল, হিরণ পয়েন্ট, নোটাবেকী, পুষ্পকাঠী, মান্দারবাড়িয়া, হলদেবুনিয়ার তো সরকার ঘোষিত অভয়ারণ্যগুলোতে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের প্রতিদিন ভ্রমণ ফি দিতে হত যথাক্রমে ১৫০ ও ১৫০০ টাকা। এখন তা দ্বিগুণ বেড়ে যথাক্রমে ৩০০ ও ৩০০০ টাকা হয়েছে। এছাড়া বেড়েছে বিভিন্ন যানবাহন প্রবেশের ফি। ফলে বর্তমানে এসব জলযানের বিভিন্ন প্যাকেজের টাকার অঙ্ক আগের থেকে কিছুটা বাড়বে।

সুন্দরবন ভ্রমণে সঙ্গে যা নেবেন

সুন্দরবন ভ্রমণে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে নিন। কারণ লঞ্চ মোংলা ছাড়ার পর কোনো লোকালয় পাবেন না; যেখান থেকে নিত্যব্যবহার্য কিছু কিনতে পারবেন। প্রয়োজনী ওষুধপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, শীতের সময় শীতবস্ত্র সঙ্গে নেবেন। শর্টস, টিশার্ট, কেডস, হ্যাট সঙ্গে নেবেন। বাইনোকুলারও সঙ্গে রাখতে পারেন। ভ্রমণে অবশ্যই চাই ক্যামেরা। তাই সঙ্গে নিন ক্যামেরা। এছাড়া ছবি তোলার জন্য স্মার্টফোনও কাজে লাগাতে পারেন।

এছাড়া পড়ার জন্য নিতে পারেন বই, জলযানে বসে খেলার মতো কিছু গেমস দাবা ইত্যাদি। তবে সর্বোপরি এই ভ্রমণে প্রয়োজন একটি সুন্দর ও খোলা মনের।

ভ্রমণের সময়

সুন্দরবন ভ্রমণের সুবিধাজনক সময় শীতকাল (নভেম্বর থেকে মার্চ মাস)। তবে বর্ষায় সুন্দরবনের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

জেনে নিন

সুন্দরবন ভ্রমণের সময় নানা রকমের জলযান ব্যবহৃত হয়। ভ্রমণ প্যাকেজ বুকিংয়ের সময় জেনে নিন কোন ধরনের জলযানে আপনি ভ্রমণ করবেন। কতজনের জন্য কেবিন নেবেন। কী কী সুবিধা রয়েছে। খাবারের আয়োজন কী। সুন্দরবন ভ্রমণে অভিজ্ঞ গাইড রয়েছে কিনা।

মনে রাখবেন

সুন্দরবন আমাদের জাতীয় সম্পদ। ভ্রমণে গিয়ে যেন এর পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। কোনো পলিথিন, ক্যান, পানির বোতল জঙ্গলে ফেলবেন না, সঙ্গে করে ফেরত নিয়ে আসুন। জীবজন্তুর জন্য বিরক্তির আওয়াজ করবেন না। মাইক বা শব্দ করে গানবাজনা একদম নিষিদ্ধ। জঙ্গলে হলুদ ও লাল রঙের পোশাক পরা থেকে বিরত থাকুন। অনেক বন্যপ্রাণী এই রঙ দেখে হিংস্র হতে পারে। যথাসম্ভব প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খেয়ে চুলন।

সতর্কতা

সুন্দরবনের ছোট ছোট খালগুলোতে রয়েছে কুমির। নৌকায় বসে খালে পা ঝুলিয়ে বসবেন না অথবা পানিতে নামবেন না। ভাটার সময় সমুদ্র বিচে নামবেন না। অনেক সময় চোরাবালির কারণে দুর্ঘটনা হতে পারে। ছোট নৌকায় চড়ার সময় ল্যাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করুন। পেশাদার ট্যুর পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ গাইড আপনাকে এবং দলবদ্ধ ভ্রমণ উপভোগে সর্বদা সহায়তা করবে।

DHAKA DINNER CRUISE®

ঢাকা ডিনার ক্রুজ

/dhakadinnercruise

নৌবিহার বুকিং চলছে

শীতলক্ষ্যা, পদ্মা, মেঘনা, কাপ্তাইলেক ও টাঙ্গুয়ার হাওর

আমাদের সেবাসমূহ

- নিয়মিত ডিনার ক্রুজ
- নিয়মিত ডে ক্রুজ
- বার-বি-কিউ ডিনার
- ফেয়ার ওয়েল ডিনার
- অফিসিয়াল কনফারেন্স
- জন্মদিন ও বিবাহ উৎসব
- অন্যান্য সেবাসমূহ।

যাত্রা শুরু

পূর্বাচল রাজউক অফিস

(কাঞ্চন ব্রীজ সংলগ্ন)

(৩০০ ফিট রাস্তা ধরে মাত্র ২০ মিনিটের যাত্রা)

- **ভ্রমণ মূল্যঃ ২৫০০++**
  (ডিনার ক্রুজ / ডে ক্রুজ)
- **ভ্রমণ মূল্যঃ ৩৫০০++**
  (দিনব্যাপী)

শর্ত প্রযোজ্য**

ঢাকা ক্রুজ এন্ড লজিস্টিকস

কর্পোরেট অফিস

বাড়ি-৯৭/১, ২য় তলা, শুক্রাবাদ
ঢাকা-১২০৭

dhakadinnercruise@gmail.com
info@dhakadinnercruise.com

www.dhakadinnercruise.com

বুকিংঃ ০১৭৩০৪৫০০৯৯, ০১৮১৯২২৪৫৯৩, ০১৭০৮৪২৭৭৯৭

ট্রাভেল টিপস

ই-পাসপোর্ট পাবেন যেভাবে

পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং বিশ্বে ১১৯তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-পাসপোর্ট করতে ঝামেলা অনেক কম। এ ছাড়া দ্রুত সময়ে ১০ বছর পর্যন্ত মেয়াদের পাসপোর্ট করা যায়। অনলাইন পেমেন্টও যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো ই-পাসপোর্ট হচ্ছে নতুন যুগের নিরাপদ পাসপোর্ট। ই-পাসপোর্টের জন্য অনলাইনে অ্যাকাউন্ট খুলে ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে সহজেই করা যাচ্ছে। এ ছাড়া আবেদনের পর কবে জমা দিতে যেতে হবে, সেই দিন তারিখ পাওয়া যাচ্ছে বলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ পাসপোর্টের মতো ই-পাসপোর্টের আবেদনও অনলাইনে পাওয়া যাবে। চাইলে পিডিএফ ফরম নামিয়ে নিয়ে হাতেও পূরণ করা যাবে। ফরম পূরণের সময় ছবি ও সত্যায়ন করা লাগবে না। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আবেদনপত্র গ্রহণের সময় আবেদনকারীর ১০ আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিশের ছবি নেওয়া হবে। সেসব তথ্য চিপে যুক্ত হবে। ইমিগ্রেশন পুলিশ বিশেষ যন্ত্রের সামনে পাসপোর্টের পাতাটি ধরতেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। ই-পাসপোর্ট দুই ধরনের। একটি ৪৮ পাতার, অন্যটি ৬৪ পাতার। সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরির জন্য ফি তিন ধরনের। দুই দিনের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে। এ জন্য ফিও বেশি গুনতে হবে।

যেভাবে আবেদন করবেন

ই-পাসপোর্টের জন্য অনলাইনে www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করা যাবে। সাইটে বাংলা বা ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করে নেওয়ার সুবিধা আছে। সেখানে শুরুতেই অনলাইনে পাসপোর্ট আবেদন: নতুন/রি-ইস্যু বাটন পাওয়া যাবে। এখানে ক্লিক করে সরাসরি আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। যেসব তথ্য চাওয়া হয় তার সঙ্গে ই-মেইল দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। একটি অ্যাকাউন্ট দিয়ে একই পরিবারের ছয়জনের আবেদন করা যায়। ই-মেইলে কনফার্মেশন মেইল আসার পর অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ করে নিতে হয়। অ্যাকাউন্ট খোলার পর অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ ই-পাসপোর্ট (Apply for a new-e-passport) ক্লিক করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য পর্যায়ক্রমে দিতে হবে।

এর আগে দেখে নিতে পারেন ই-পাসপোর্ট আবেদনের ৫টি (পাঁচ) ধাপ। একটি ধাপ হচ্ছে বর্তমান বসবাসরত জেলাতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে কি না, তা দেখা। এর পরেরগুলো হচ্ছে অনলাইনে ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরম, পাসপোর্ট ফি পরিশোধ, ছবি ও ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য পাসপোর্ট অফিসে যোগাযোগ ও পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট সংগ্রহ। এর মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই, আবেদনকারীর ছবি তোলা, আঙুলের ছাপ ও আইরিশের ছবি গ্রহণ, যথাযথভাবে পাসপোর্ট ফি পরিশোধ হয়েছে কি না এবং তালিকাভুক্তির পর সরবরাহ করা ডেলিভারি স্লিপ সংরক্ষণ। পাসপোর্ট গ্রহণের সময় ডেলিভারির রসিদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া সর্বশেষ পুরনো পাসপোর্ট (যদি থাকে) নিতে হবে। ই-পাসপোর্ট আবেদন অনলাইনে দাখিল করার সময়ে পাসপোর্ট ফি পরিশোধ করা যাবে। পাসপোর্ট ফি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হবে।

বাংলাদেশের পাসপোর্ট অফিসের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে অনলাইনে পেমেন্ট করা যাবে। অনলাইন পেমেন্ট ছাড়াও ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া এবং ঢাকা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া যাবে। সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট দেওয়া হয় এবং এখন পর্যন্ত চালু করা অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি হলো স্টারকার্ড, ভিসা, কিউ-ক্যাশ, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বিকাশ ও ডিবিবিএল নেক্সাস। অনলাইনে পেমেন্ট করার জন্য আপনার ব্রাউজারের পপ-আপ ব্লকার অক্ষম করতে হবে।

ফি কত

৫ বছর মেয়াদি ২১ দিনের নিয়মিত সরবরাহ ৪ হাজার ২৫ টাকা, ১০ দিনের দ্রুত সরবরাহ ৬ হাজার ৩২৫ টাকা, ২ দিনে সুপার এক্সপ্রেস ডেলিভারি ৮ হাজার ৬২৫ টাকা। ৪৮ পৃষ্ঠা ১০ বছর মেয়াদি ২১ দিন ডেলিভারি ৫ হাজার ৭৫০ টাকা, ১০ দিনের ডেলিভারি ৮ হাজার ৫০ টাকা ও ২ দিনের ডেলিভারি ১০ হাজার ৩৫০ টাকা। ৬৪ পৃষ্ঠা ৫ বছর মেয়াদি ২১ দিনের ডেলিভারি ৬ হাজার ৩২৫, ১০ দিনের ডেলিভারি ৮ হাজার ৬২৫, ২ দিনের ডেলিভারি ১২ হাজার ৭৫ টাকা, ৬৪ পৃষ্ঠা ১০ বছর মেয়াদি ২১ দিনের ডেলিভারি ৮ হাজার ৫০, ১০ দিনের ডেলিভারি ১০ হাজার ৩৫০, ২ দিনের ডেলিভারি ১৩ হাজার ৮০০ টাকা।

ই-পাসপোর্টের সুবিধা

ই-পাসপোর্টের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর মাধ্যমে ই-গেট ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে ভ্রমণকারীরা যাতায়াত করতে পারবেন। ফলে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ভিসা চেকিংয়ের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এর মাধ্যমেই ইমিগ্রেশন দ্রুত হয়ে যাবে।

ই-গেটের নির্দিষ্ট স্থানে পাসপোর্ট রেখে দাঁড়ালে ক্যামেরা ছবি তুলে নেবে। থাকবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাইয়ের ব্যবস্থাও। সব ঠিক থাকলে তিনি ইমিগ্রেশন পেরিয়ে যেতে পারবেন। কোনো গরমিল থাকলে জ্বলে উঠবে লালবাতি। কারো বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকলে, সেটিও জানা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

ই-পাসপোর্ট ফরম পূরণের নির্দেশাবলী

১. ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করা যাবে।
২. ই-পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো কাগজপত্র সত্যায়ন করার প্রয়োজন হবে না।
৩. ই-পাসপোর্ট ফরমে কোনো ছবি সংযোজন এবং তা সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না।
৪. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ (BRC English Version) অনুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী যার জাতীয় পরিচয়পত্র নাই, তার মা অথবা বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
৬. জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ নিম্নোক্ত বয়স অনুসারে দাখিল করতে হবে-
(ক) ১৮ বছরের নিম্নে হলে অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ।
(খ) ১৮-২০ বছর হলে জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ।
(গ) ২০ বছরের উর্ধ্বে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যক। তবে বিদেশে বাংলাদেশ মিশন থেকে আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ গ্রহণযোগ্য হবে।
৭. আবেদন ফরমে তারকা চিহ্নিত ক্রমিক নাম্বারগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
৮. দত্তক/অভিভাবকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনের সঙ্গে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা আদেশ দাখিল করতে হবে।
৯. আবেদন বর্তমান ঠিকানা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস/বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করতে হবে।
১০. ১৮ বছরের নিম্নের এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে সব আবেদনে ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে ৫ বছর ও ৪৮ পৃষ্ঠার।
১১. প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহ (যেমন: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) আপলোড/সংযোজন করতে হবে।
১২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক জিও (GO)/এনওসি (NOC)/প্রত্যয়নপত্র/ অবসরোত্তর ছুটির আদেশ (PRL Order)/পেনশন বই আপলোড/সংযোজন করতে হবে; যা ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে আপলোড থাকতে হবে।
১৩. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিবাহ সনদ/নিকাহনামা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তালাকনামা দাখিল করতে হবে।
১৪. দেশের অভ্যন্তরে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফির ওপর নির্ধারিত হারে ভ্যাটসহ অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) অতিরিক্ত হিসাবে দিতে হবে। বিদেশে আবেদনের ক্ষেত্রেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি দিতে হবে।
১৫. কূটনৈতিক পাসপোর্টের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও ওয়েলফেয়ার উইং অথবা ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
১৬. বৈদেশিক মিশন থেকে নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা হলে স্থায়ী ঠিকানার কলামে বাংলাদেশের যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।
১৭. অতি জরুরি পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে (নতুন ইস্যু) নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ পূর্বক আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।
১৮. (ক) দেশের অভ্যন্তরে অতি জরুরি পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সঙ্গে পুলিশ কিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সব তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে ২ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
(খ) দেশের অভ্যন্তরে জরুরি পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সঙ্গে পুলিশ কিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সব তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
(গ) দেশের অভ্যন্তরে রেগুলার পাসপোর্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের সঙ্গে পুলিশ কিয়ারেন্স দাখিল করা হলে অন্যান্য সব তথ্য সঠিক থাকা সাপেক্ষে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।
১৯. আবেদনের সময় মূল জাতীয় পরিচয়পত্র, অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সনদ, সরকারি আদেশ (GO)/অনাপত্তি (NOC) প্রদর্শন/দাখিল করতে হবে।
২০. পাসপোর্ট রি-ইস্যুর ক্ষেত্রে মূল পাসপোর্ট প্রদর্শন করতে হবে।
২১. হারানো পাসপোর্টের ক্ষেত্রে মূল জিডির কপি প্রদর্শন/দাখিল করতে হবে।
২২. ৬ বছর বয়সের নিম্নের আবেদনের ক্ষেত্রে ৩ আর (3R Size) সাইজের (ল্যাব প্রিন্ট গ্রে ব্যাকগ্রাউন্ড) ছবি দাখিল করতে হবে।
২৩. পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় জিডি করতে হবে। পুনরায় পাসপোর্টের জন্য আবেদনের সময় পুরাতন পাসপোর্টের ফটোকপি এবং জিডি কপিসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে ।

তথ্য সূত্র : বহিরাগমন শাখা ১, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জেনে রাখুন

ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্মনিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নাম্বার অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র অনলাইনে অথবা পিডিএফ ফরমেট ডাউনলোড করে পূরণ করা যাবে। এতে কোনো ছবি এবং কোনো ধরনের কাগজপত্র সত্যায়নের প্রয়োজন নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদপত্রসহ বাবা-মায়ের এনআইডির কপি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আবেদনপত্র গ্রহণের সময় হাতের ১০ আঙুলের ছাপ, ছবি ও চোখের আইরিশ ফিচার নেওয়া হবে। ই-পাসপোর্টের ক্ষেত্রেও পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রয়োজন হবে। অতি জরুরি ক্ষেত্রে ই-পাসপোর্ট করার জন্য প্রি-পুলিশ ভেরিফিকেশন নিজ উদ্যোগে করে নিয়ে যেতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থার মতো ই-পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ভিসার বিষয়টি একই থাকবে। ভিসা কর্তৃপক্ষ বা দূতাবাসগুলো এই পিকেডি ব্যবহার করে আবেদনকারীর তথ্য যাচাই করে নিতে পারবে। এরপর বইয়ের পাতায় ভিসা স্টিকার, সিল দিতে পারবে বা বাতিল করে দিতে পারবে। ই-পাসপোর্টের পাশাপাশি এমআরপিও চালু থাকবে। তবে নতুন করে কাউকে এমআরপি দেওয়া হবে না। পর্যায়ক্রমে সব এমআরপি তুলে নেওয়া হবে। আবেদন করার বিস্তারিত নিয়মাবলি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

অনলাইন চেক

ই-পাসপোর্ট পোর্টালে 'স্ট্যাটাস চেক' করা যাবে। জন্মতারিখ ও আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সার্চ অপশনে ক্লিক করতে হবে। আপনার অনলাইন পোর্টাল অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার সব আবেদনের অবস্থা দেখতে পারবেন।

বান্দরবান

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অন্যতম একটি জেলা বান্দরবান। সাংগু নদীর তীরে পাহাড়ের ঢালে ঢালে এই শহরের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এই জেলার সর্বত্রই রয়েছে বেড়ানোর মতো অসংখ্য জায়গা

মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র

বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে বান্দরবান-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশেই রয়েছে এই পর্যটন কেন্দ্রটি। এখানে আছে একটি কৃত্রিম লেক। লেকের এপার থেকে ওপারে যেতে পারেন ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে। ইচ্ছে হলে লেকের মধ্যে স্পিটবোড নিয়ে ঘুরতে পারেন।

সাংগু নদী

বান্দরবানে বেড়াতে গেলে সাংগু নদীতে নৌ ভ্রমণ করতে ভুলবেন না। এত স্বচ্ছ পানির নদী এই দেশে খুবই বিরল। এছাড়া এর দুই কিনারে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। শহরের সাংগু সেতুর নিচ থেকে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

বুদ্ধ জাদি

শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে জাদির পাহাড়ে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় স্বর্ণ মন্দির। রিকশা বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে যেতে পারেন বুদ্ধ জাদি। পাহাড় বেয়ে এখানকার মন্দিরটিতে দেখতে পাবেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নানান কার্যক্রম। অত্যন্ত নান্দনিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এই মন্দির।

শৈলপ্রপাত

বান্দরবান শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে রয়েছে শৈলপ্রপাত। চারদিকে পাথর সমেত বিরাট জাগয়াজুড়ে এখানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝরনা। ঝরনা দেখে ঢু মেরে আসতে পারেন পাশের ত্রিপুরা পল্লী থেকে।

চিম্বুক পাহাড়

বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে চিম্বুক পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় চোখের সামনে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় একেবারে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। শহর থেকে চাঁদের গাড়িতে করে এখানে যেতে পারেন।

রুমা বাজার

জেলা শহর থেকে প্রতিদিন চাঁদের গাড়ি ছাড়ে রুমার উদ্দেশে। যেতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। গাড়ি থেকে নেমে রুমা ঘাটে নেমে সেখান থেকে রুমা বাজারে আসতে হবে নৌকায়। রুমা বান্দরবানের একটি থানা শহর। এখানকার চারদিকের প্রকৃতি আপনার হৃদয় ছুঁয়ে দেবে। এখানে গেলে দেখতে পাবেন বম উপজাতিদের জীবনাচরণ।

বগা লেক

বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচুতে যে লেক তার নামই বগা লেক। বগা লেকে যেতে হবে রুমা বাজার থেকে। বৃষ্টি না থাকলে এখানে যেতে মাঝে মধ্যে জিপ পাওয়া যায়। অন্যথায় একমাত্র উপায় পায়ে হাঁটা। আর হেঁটে গেলে লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা। এখানে রাতেও থাকতে পারেন। থাকার জন্য আছে ইয়ং বম অ্যাসোসিয়েশনের রেস্ট হাউজ। বগা লেক থেকে কেওক্রাডাং খুব বেশি দূরে নয়। প্রস্তুতি থাকলে দেখে আসতে পারেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চূড়াকেও।

যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে সরাসরি বান্দরবান যায় এস আলম, ডলফিন, দেশ ট্রাভেলস, সৌদিয়া, সেন্টমার্টিন, ইউনিক, হানিফ, শ্যামলী ও ঈগল পরিবহণের এসি/নন এসি বাস। এছাড়া রেল ও বিমানে চট্টগ্রাম এসে সেখান থেকেও সহজে যেতে পারেন বান্দরবান। চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল থেকে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানির বাস চলাচল করে। অথবা কক্সবাজার হয়ে আসতে পারেন পর্যটকরা। কক্সবাজার-বান্দরবান বাস সার্ভিস রয়েছে। রাঙামাটি-বান্দরবান রুটে সরাসরি বাস সার্ভিস চলাচল করে।

কোথায় থাকবেন

জেলা শহরে ও শহরতলিতে অনেক ভালো মানের আবাসিক হোটেল ও অবকাশ যাপন কেন্দ্র রয়েছে। যেমন- মেঘলা পর্যটন মোটেল, হলিডে ইন, হোটেল প্লাজা, হোটেল পূরবী, হোটেল ফোর স্টার, হোটেল হিলবাড, হোটেল গ্রিন হাউজ ও প্রু আবাসিকা। শহরের বাইরে একেবারে প্রকৃতির মাঝে থাকতে চাইলে হিলসাইড রিসোর্ট বা সেনাবাহিনী পরিচালিত নীলগিরি রিসোর্ট উঠতে পারেন।

দেশে বেড়ানো

রাঙামাটির কোথায় ঘুরবেন

কাপ্তাই লেকের বুকে জেগে থাকা ছোট্ট একটি শহর রাঙামাটি। এই শহরের পরতে পরতে রয়েছে বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। লেকের বাঁকে বাঁকে পেঁচানো এই শহর থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন। এখানে স্বচ্ছ পানির লেকে ঝিরিঝিরি বাতাসে নৌকা ভ্রমণ ও পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দূর পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। রাঙামাটি প্রকৃতির লীলায়িত নন্দনকানন; যার পূর্ব নাম কার্পাস মহল। পরে নিউ রাঙামাটি, কালের প্রবাহে এখন রাঙামাটি। বাংলাদেশের ৬,১১৬.১৩ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ ভূখণ্ড এই রাঙামাটি পার্বত্য জেলা। এর উত্তর ও পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং পশ্চিমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রাম জেলা। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বর্ণময় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং তাদের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য রাঙামাটি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সব সময় আকৃষ্ট করে। রাঙামাটির আকর্ষণীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

উপজাতীয় জাদুঘর

রাঙামাটি গেলে প্রথমেই যেতে পারেন উপজাতীয় জাদুঘরে। এখানে উপভোগ করতে পারবেন রাঙামাটিসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী নানান উপজাতির জীবনাচরণ ও নানা তথ্য। ছোট অথচ অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই জাদুঘরটি খোলা থাকে সোম থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। শনি, রবি ও সরকারি ছুটির দিনগুলোতে জাদুঘর বন্ধ থাকে।

রাজবন বিহার

এ জায়গা থেকে সরাসরি চলে যেতে পারেন রাঙামাটি শহরের রাজবন বিহারে। এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি তীর্থ স্থান এই রাজবন বিহার।

এখানে আছে একটি প্রার্থনালয়, একটি প্যাগোডা, বনভান্তের (বৌদ্ধ ভিক্ষু) আবাস্থল ও ভোজনালয়। প্রতি শুক্রবার ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে চলে প্রার্থনা। রাজবন বিহারে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে পারেন কাপ্তাই লেকের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।

রাজবাড়ি

রাজবন বিহারের পাশেই কাপ্তাই লেকের একটি দ্বীপজুড়ে রয়েছে চাকমা রাজার রাজবাড়ি। নৌকা দিয়ে এই রাজবাড়িতে যেতে পারেন। অনেক উপজাতির মধ্যে এখনো চালু রয়েছে রাজপ্রথা। আঁকাবাঁকা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গাছের ছায়ায় ঘাট বাধানো পথের মাথায় এই বাড়িটি দেখে ভালো লাগবে আপনার। এখানে রয়েছে চাকমা সার্কেলের প্রশাসনিক দপ্তরও।

রিজার্ভ বাজার

এবার নৌকা দিয়ে লেক পার হয়ে গাড়িতে করে চলে আসুন রিজার্ভ বাজারে। ঘুরে ফিরে দেখুন রাঙামাটির ব্যস্ততম এই জায়গাটি। রিজার্ভ বাজার থেকেই রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে। রিজার্ভ বাজার ঘুরে এবার নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত! খেয়ে নিন এখানকার যে কোনো রেস্টুরেন্টে। রিজার্ভ বাজার থেকে এবার চলুন পর্যটন কমপ্লেক্সে।

পর্যটন কমপ্লেক্স ও ঝুলন্ত সেতু

পুরো রাঙামাটি শহরের সব জায়গাতে লোকাল গাড়ি চললেও এখানে যেতে হবে রিজার্ভ নিয়ে। গাড়িতে তবলছড়ি বাজারে এসে সেখান থেকে পায়ে হেঁটেও পর্যটন কমপ্লেক্সে আসতে পারেন। তবলছড়ি বাজার থেকে এখানকার দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এই অল্প পথ নিমিষেই ফুরিয়ে যাবে। একেবারে হাঁটতে মন না চাইলে এখান থেকে রিজার্ভ গাড়ি নিতে পারেন। রাঙামাটির কথা ভাবলে প্রথমে কল্পলোকে যে ছবিটি সবার আগে ভেসে উঠে সেটি হলো পাহাড়ের কোলে রঙিন একটি ঝুলন্ত সেতু। হ্যাঁ, পর্যটন কমপ্লেক্সের ভেতরেই রয়েছে সুন্দর এই ঝুলন্ত সেতু। ঝুলন্ত সেতু ধরে যতই সামনে এগোবেন ততই ছবির মতো দৃশ্য আপনার দুই চোখকে হাতছানি দেবে। ইচ্ছে হবে কাপ্তাই লেকের ভেতরে দূর পাহাড়ি কোনো দ্বীপে চিরদিনের জন্য থেকে যেতে। সেতু পেরিয়ে সামনের পাহাড়ে উঠে ইচ্ছেমতো ঘুরতে পারেন। এখানে থাকতে পারবেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে কাপ্তাই লেকে নৌকা ভ্রমণ করতে পারেন। নৌ ভ্রমণের জন্য এখানেই পেয়ে যাবেন নানা রকম বাহন। এখান থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে যেতে পারেন প্যাদা টিং টিং কিবা শুভলং।

শুভলং ঝরনা

এটি রাঙামাটি সদর ও বরকল উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায়। রাঙামাটি শহরের বনরূপা, গর্জনতলী থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় যেতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা। স্পিডবোটে সময় লাগবে ১০ থেকে ১৫ মিনিট। শুকনো মৌসুমে এই ঝরনা দেখা যায় না।

সাজেক

সাজেক রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই পর্যটন স্থানটি ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিদিন হাজারো পর্যটক সাজেকে বেড়াতে আসেন। সাজেক থেকে ভারত দেখা যায়। ভোরে মেঘের সঙ্গে খেলা করা যায়। সূর্যোদয়ের আগে মেঘগুলো যেন আলিঙ্গন করে চলে যায়। সাজেক রাঙামাটি জেলায়

অবস্থিত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হয়ে সাজেকে যান পর্যটকরা। ইতোমধ্যে সাজেকে বাণিজ্যিকভাবে শতাধিক রিসোর্ট গড়ে উঠেছে।

যেভাবে যাবেন

রাজধানী ঢাকার গাবতলী, কলাবাগান, পান্থপথ, ফকিরাপুল থেকে ডলফিন, শ্যামলী, হানিফ, ইউনিক, সেন্টমার্টিন, এস আলম বাসে রাঙামাটি আসতে পারেন। শ্যামলী ও সেন্টমার্টিনে এসি সার্ভিস চালু আছে। এছাড়া অন্যান্য বাস, ট্রেন কিংবা বিমানে চট্টগ্রাম আসতে পারেন। শহরের সিনেমা প্যালেস ও বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাঙামাটিতে বাস চলাচল করে।

কোথায় থাকবেন

রাঙামাটিতে থাকার জন্য রয়েছে অনেক হোটেল-মোটেল। রয়েছে বিভিন্ন সরকারি বিশ্রামাগার। কাতালতলি এলাকায় সুফিয়া ইন্টারন্যাশনাল, সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল, তবলছড়ির পর্যটন মোটেল, রিজার্ভ বাজারে মোটেল মতিমহল, গ্রিন ক্যাসেল, হোটেল প্রিন্স, লেকসিটি, কলেজগেটে মোটেল জজ, রাজবাড়িতে হোটেল ডিগনিটি অন্যতম। কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় হোটেল শাপলা, ড্রিমল্যান্ড অন্যতম।

কোথায় খাবেন

রাঙামাটিতে বেড়াতে এসে অনেকে আদিবাসী খাবার খেতে চান। তাদের জন্য শহরের রাজবাড়ি এলাকায় রয়েছে একাধিক হোটেল। এর মধ্যে টুগুন রেস্টুরেন্ট, পিবির ভাতঘর, বিজুফুল, স্টিফেন ভাতঘর, বনরূপা বাজারে যদন ক্যাফে, আইরিশ অন্যতম। এছাড়া যারা সাধারণ খাবার খেতে চান, তাদের জন্য আছে বনরূপা বাজারে দারুচিনি, মেজবান ও ক্যাফে লিংক। কাপ্তাই লেকের মাঝখানে দ্বীপের কোথাও খেতে মন চাইলে চাং পাং, প্যাদা টিং টিং, মেজাং, গরবা রেস্টুরেন্টে খাওয়া যায়। তবে পরিবহণ খরচের তারতম্যের কারণে দাম শহরের রেস্টুরেন্টের চেয়ে এখানে একটু বেশি।

বিউটি বোর্ডিং ইতিহাসের নস্টালজিয়া

আহসান জোবায়ের

পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশের সড়ক ধরে কিছু দূর সামনে গেলে পড়বে শ্রীশ দাস লেন। এ লেনে ঢুকতেই চোখে পড়ে একটি জমিদার বাড়ি। এর পাশেই দোতলা একটি বাড়ি। বাড়ির লোহার ছোট্ট গেট পেরোলেই ফুলের বাগান। বাগানের মাঝখানে দুর্বাঘাসে মোড়ানো ফাঁকা জায়গায় আড্ডা দেয়ার স্থান। এখান থেকেই মোড় ঘুরে গিয়েছিল একটি দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির। আড্ডাবাজ একদল মানুষের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছিল অন্য এক জাতিসত্তা। কবি-সাহিত্যিকদের কাছে পুরান ঢাকার বিউটি বোর্ডিং ছিল আড্ডার কেন্দ্রস্থল। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, রাজনীতিবিদ, চলচ্চিত্রকারদের অবাধ বিচরণ ও আড্ডার প্রাণকেন্দ্র ছিল এই বিউটি বোর্ডিং। প্রাচীন আমলের গাঁথুনি মুহূর্তেই যে কাউকে নিয়ে যাবে একশ বছর পেছনে। বোর্ডিং কম্পাউন্ডের মাঝখানে প্রশস্ত উঠান। ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। বেশ আড্ডার জায়গা। পাশে খাবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে প্রাচীন আড্ডার কয়েকটি ছবি। এরপর শোবার ঘর, পেছনে সিঁড়িঘর- সবই গল্পের বইয়ে লেখা প্রাচীন জমিদার বাড়ির বর্ণনার মতো। প্রসারিত উঠানের মাঝে ফুলবাগান আর এক কোনায় শামসুর রহমান স্মৃতিফলক যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। একটু সামনে এগোলেই দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধের ১৭ জন শহীদের নামফলক। এতে করে আনন্দের উদ্বেলতায় মুহূর্তেই নীরবতা নেমে আসবে। শোকের পরিবেশে শ্রদ্ধা আর আবেগে মুক্তিযুদ্ধের ক্যানভাস চিত্রিত হবে আগতদের মানসপটে। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সময়ের মিলনক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে হারিয়ে যাবেন দর্শনার্থীরা। এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানই নয়, প্রযুক্তির এ সময় বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে থাকা নস্টালজিয়ার এক ঐতিহাসিক স্থাপনা। নান্দনিক সৌন্দর্যের স্থাপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে এর জৌলুস। জন্মলগ্ন থেকেই এখানে আড্ডা দিতেন প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক, নৃত্যশিল্পী, গায়ক, অভিনেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এক সময় প্রমত্তা বুড়িগঙ্গার ভরা যৌবনের মতোই বর্ণাঢ্য ছিল বিউটি বোর্ডিংয়ের সেই দিনগুলো। বুড়িগঙ্গার তীরে জাহাজের হুইসেলের ধ্বনি আর নদীর কলকল শব্দে কবি-সাহিত্যিকদের কলম থেকে বের হতো সৃজনশীলতা। আজ বুড়িগঙ্গা হারিয়েছে তার স্রোত আর বিউটি বোর্ডিংও হারিয়েছে এর জৌলুস। নতুন প্রজন্মের নাগরিকদের কাছে খুব চেনাজানা না হলেও বোদ্ধামহল ও সুধীজনের কাছে এর কদর একটুও কমেনি। যে কারণে এখনো একটু সময় পেলেই অনেকেই এখানে ছুটে আসেন। মূলত চল্লিশের দশকেই পুরান ঢাকায় খ্যাতি লাভ করে বিউটি বোর্ডিং।

বিউটি বোর্ডিংয়ের আড্ডা আগের মতো না থাকলেও খাবার ঘরে এখনো ভোজনরসিকদের ভিড় লেগেই থাকে। নগরের ভোজনরসিকরা এখানে ছুটে আসেন। ঐতিহ্য ধরে রাখতে আজও এখানে স্টিলের থালায় ও গ্লাসে খাবার ও পানি পরিবেশন করা হয়। সকালে নাস্তা, দুপুরে ভাত, বিকালে সুস্বাদু লুচি এবং রাতেও রয়েছে খাবারের ব্যবস্থা। বিউটি বোর্ডিংয়ে বিভিন্ন রকমের সবজি বিক্রি হয়। এখানে প্রতিদিনকার মেন্যুতে থাকে বেগুনভাজি, করলাভাজি, কচুশাক, লালশাক, কলাভর্তা, শিমভর্তা আর ধনেপাতাভর্তা। সকালে এক সময় আটার রুটির রেওয়াজ ছিল। এখন সকালের রুটির জায়গা নিয়েছে ভাত, আলুভর্তা, ডিমভাজি আর ডাল। রাতের রান্না সীমিত আকারের। এক পদের মাছ, সবজি আর ডাল। তবে দধি এখানে তিন বেলাই পাওয়া যায়। বিউটি বোর্ডিংয়ের দধির খুব চাহিদা। সব খাবারই বেশ তৃপ্তিদায়ক। বিউটি বোর্ডিংয়ে ছোট-বড় মিলিয়ে কক্ষ রয়েছে ২৫টি। স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও এখানকার বেশির ভাগ কক্ষই খালি থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সময়ের পরিক্রমায় নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে তিলোত্তমা রাজধানী ঢাকা। কিন্তু ঢাকা তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্য বিউটি বোর্ডিং যেন আধুনিকতার উত্থানে পিছিয়ে পড়া এক ঐতিহ্য।

বিউটি বোর্ডিংয়ের ইতিহাস

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে প্রহ্লাদ সাহা ও তার ভাই নলিনী মোহন সাহা তৎকালীন জমিদার সুধীর চন্দ্র দাসের কাছ থেকে ১১ কাঠা জমি নিয়ে সেখানে নির্মাণ করেন এই বিউটি বোর্ডিং। বিউটি বোর্ডিং বাড়িটি ছিল নিঃসন্তান জমিদার সুধীর চন্দ্র দাসের। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে সেখানে ছিল সোনার বাংলা পত্রিকার অফিস। কবি শামসুর রহমানের প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল এ পত্রিকায়। দেশ ভাগের সময় পত্রিকা অফিসটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর ১৯৪৯ সালে দুই ভাই প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহা ও নলিনী মোহন সাহা এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে গড়ে তোলেন বিউটি বোর্ডিং। বাড়িটি ১১ কাঠা জমির ওপর তৈরি। নলিনী মোহনের বড় মেয়ে বিউটির নামেই এর নামকরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ বিউটি বোর্ডিংয়ে পাকিসন্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহাসহ ১৭ জন। পরবর্তীতে প্রহ্লাদ চন্দ্রের পরিবার ভারত চলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে প্রহ্লাদ চন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা সাহা দুই ছেলে সমর সাহা ও তারক সাহাকে নিয়ে বিউটি বোর্ডিং আবার চালু করেন। তখনকার সাহিত্য আড্ডার জন্য অনেক স্থান থাকলেও সবার পছন্দের জায়গা ছিল এ বিউটি বোর্ডিং। এখানে আড্ডা দিয়েছেন এ দেশের বিখ্যাত সব কবি-সাহিত্যিক, চিত্রপরিচালক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার কিংবদন্তিরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এ ঐতিহাসিক স্থানে এসেছিলেন নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসু ও পল্লীকবি জসিমউদ্দীন।

আন্দোলনের ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র ছিল পুরান ঢাকা। তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ, বিউটি বোর্ডিং ছিল বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে। ষাটের দশকের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন বিউটি বোর্ডিং থেকেই শুরু হয়। ৬২, ৬৯ ও ৭০-এর নির্বাচনের ইতিহাস পুরান ঢাকা ও বিউটি বোর্ডিংয়ের সঙ্গে জড়িত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭০-এর নির্বাচনে এ আসন থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখান থেকেই ষাটের দশকের আন্দোলনের পরামর্শ হতো। সেসময় দলমত নির্বিশেষে সবাই পাকিস্তান

বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। জগন্নাথ কলেজ ছিল স্বাধীনতার আঁতুড়ঘর। সেসময়কার সবার দেশপ্রেম ছিল এমন যে, সবাই একেক জন সূর্যসেন ও প্রীতিলতা। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গুলি ছোড়া হয় পুরান ঢাকা থেকে। এই যে বিউটি বোর্ডিং এখানকার অবদান কম নয়। এ জায়গাটা ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

যাদের পদভারে মুখরিত ছিল

বিউটি বোর্ডংয়ের জন্মলগ্ন থেকেই এখানে আড্ডা দিতেন প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক, নৃত্যশিল্পী, গায়ক, অভিনেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণি- পেশার মানুষ। এখানে যারা আড্ডার আসরে আসতেন এদের মধ্যে কবি শামসুর রহমান, রণেশ দাশগুপ্ত, ফজলে লোহানী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, ব্রজেন দাস, হামিদুর রহমান, বিপ্লব দাশ, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, আহমেদ ছফা, হায়াৎ মাহমুদ, সত্য সাহা, এনায়েত উল্লাহ খান, আল মাহমুদ, আল মুজাহিদী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ড. মুনতাসীর মামুন, ফতেহ লোহানী, জহির রায়হান, খান আতা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ শামসুল হক, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নির্মল সেন, ফয়েজ আহমদ, গোলাম মুস্তাফা, খালেদ চৌধুরী, সমর দাস, ফজল শাহাবুদ্দিন, সন্তোষ গুপ্ত, আনিসুজ্জামান, নির্মলেন্দু গুণ, বেলাল চৌধুরী, শহীদ কাদরী, ইমরুল চৌধুরী, সাদেক খান, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শফিক রেহমান, মহিউদ্দিন আহমেদ, আসাদ চৌধুরী, সিকদার আমিনুর হক, জুয়েল আইচ প্রমুখ।

চলচ্চিত্র শিল্পের কিংবদন্তি আব্দুল জব্বার খান বিউটি বোর্ডিংয়ে বসেই লেখেন বাংলার প্রথম সবাক ছবি 'মুখ ও মুখোশ'র চিত্রনাট্য। প্রখ্যাত সুরকার সমর দাস বহু কালজয়ী বাংলা গানের সুর সৃষ্টি করেছিলেন এখানে আড্ডা দেওয়ার ফাঁকে। বুলবুল চৌধুরী তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অতলের কথকতা'য় তার বন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন, 'কায়েস আহমেদই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বিউটি বোর্ডিংয়ে জড়ো হওয়া কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের সামনে। বিউটি বোর্ডিংয়ে সমবেত হতে পারার মাধ্যমে দেশের অনেক নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছাকাছি হতে পেরেছিলাম।' ১৯৫৭ সালে কবি ফজল শাহাবুদ্দিন এখান থেকেই প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা 'কবিকণ্ঠ', ১৯৫৯ সালে আহমদ ছফার সাহিত্য পত্রিকা 'স্বদেশ'র উত্থানও বিউটি বোর্ডিং থেকেই। জাদুকর জুয়েল আইচের সূচনাও এখানেই। আর সুরকার সমর দাস বহু গানের সুর তৈরি করেছেন এখানে বসে। বিউটি বোর্ডিং নিয়েই শামসুর রাহমান লিখেছেন 'মনে পড়ে একদা যেতাম প্রত্যহ দুবেলা বাংলাবাজারের শীর্ণ গলির ভেতরে সেই বিউটি বোর্ডিংয়ে পরস্পর মুখ দেখার আশায় আমরা কজন'।

১৯৫৭ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত এখানে বসেই লেখালেখি করতেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। বরেণ্যদের কাছে আজ এটি একটি স্মৃতির পটে আঁকা এক চিত্রকল্প, এক কষ্টের হাহাকার। ঐতিহ্য ঠিকই আছে, এখনই ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি। কালের বিবর্তনে স্বর্ণালি সময়গুলো এখন কেবলই ইতিহাস।

বিউটি বোর্ডিং সম্মাননা

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত টানা ২২ বছর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী, রাজনীতিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল বিউটি বোর্ডিং। এরপর ১৯৭১ সালের উত্তাল সেই দিনগুলোর ২৮ মার্চ ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুন

করার পর দৃশ্যপট পাল্টে যায়। স্বাধীনতার পর নতুন করে যাত্রা শুরু করলেও স্বর্ণালি দিন আর ফিরে আসেনি।

এরপর ১৯৯৫ সালে সাবেক বিউটিয়ানদের নিয়ে গঠিত হয় বিউটি বোর্ডিং সুধী ট্রাস্ট। আর ২০০৩ সালে কবি ইমরুল চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও প্রয়াত তারক সাহাকে সদস্য সচিব করে ৬০ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। আর এ ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে ২০০৫ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে 'বিউটি বোর্ডিং সম্মাননা'। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

স্মৃতি রোমন্থনে মিলনমেলা

প্রকাশনী ও ছাপাখানার বদৌলতে বইয়ের জগৎ পুরান ঢাকার বাংলাবাজার। শ্রীশ দাস লেনের বাংলাবাজারের পাশে অবস্থিত বিউটি বোর্ডিং। বই প্রকাশ ও বই সংগ্রহের কারণে কবি-সাহিত্যিকদের আসা যাওয়া হতো বাংলাবাজারে। দেশ-বিভাগের পূর্বে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকার অফিস বর্তমান বিউটি বোর্ডিংয়ে ছিল কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডাস্থল। ষাটের দশকের বাংলা কবি-সাহিত্যিকদের জাগরণে বিউটি বোর্ডিং ছিল প্রাণবন্ত। তৎকালীন দেশের প্রেক্ষাপটে তারা রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা করতেন কবিতা, নাটক, গল্প ও উপন্যাস। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগে বিউটি বোর্ডিংয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আসা যাওয়া ছিল। ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের মার্শাল ল' বিরোধী আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার ছিল পুরান ঢাকার এ বিউটি বোর্ডিং। প্রতিবছরই ৬০ দশকের কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলায় পরিণত হয় বিউটি বোর্ডিং। ঢাকা শহরের ষাটের দশকের একাত্তরের বিপ্লবী সতীর্থদের মিলনমেলার আয়োজক পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি ফিরোজ কবির মুকুল। সবাই স্মৃতি রোমন্থনে ফিরে যান ৬০-এর দশকে।

টাঙ্গুয়ার হাওড় ভ্রমণ সহায়িকা

বিশ্বে দিন দিন ইকো-ট্যুরিজমের পরিধি বেড়েই চলছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজমের উন্নয়ন সম্ভব। ইকো-ট্যুরিজম হচ্ছে কোনো এলাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ যা ওই এলাকার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ইকো-ট্যুরিজমে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায় তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এবং অর্জিত আয়ের একটি অংশ ওই এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশে ব্যবহার হয়ে থাকে। **পর্যটন বিচিত্রা** দেশের পর্যটন উন্নয়নের নানা বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এরই অংশ হিসেবে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ইকো-ট্যুরিজম নিয়ে এবারের প্রতিবেদন। লিখেছেন– **মামুন আব্দুল কাইউম**।

বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল চেরাপুঞ্জির খুব কাছেই অবস্থিত রামসার সাইট টাঙ্গুয়ার হাওড়। সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে এ হাওড়ের অবস্থান। হাওড়ের চার পাশে রয়েছে ৮৮টি গ্রাম। 'ছয় কুড়ি বিল আর নয় কুড়ি কান্দা'র সমন্বয়ে পরিচালিত দৃষ্টিনন্দন বিলটির দৈর্ঘ্য ১১ ও প্রস্থ ৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের ৯,৭২৭ হেক্টর এলাকাকে 'পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' ঘোষণা করে। হাওড়টি দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট এবং পৃথিবীর ১০৩১তম রামসার সাইটের মর্যাদা পায় ২০০০ সালে। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে হাওড়টি উল্লেখযোগ্য। তা হলো- জলাভূমি পরিবেশের অন্যন্য উদাহরণ, জলচর পাখি, সংকটাপন্ন প্রজাতির মাছ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল এবং মা মাছের উত্তম প্রজননস্থল। এ হাওড়ে ছোট বড় ১০৯টি বিল আছে। তবে প্রধান বিল ৫৪টি। এর মধ্যে ১৬টিতে সারা বছরই পানি থাকে। এ হাওড়ে ১২০টি কান্দায় প্রায় ৬০ হাজরের বেশি মানুষ বাস করে।

টাঙ্গুয়ার হাওড়কে বলা হয় দেশি মাছের আধার বা 'মাদার ফিশারিজ'। জলজ প্রাকৃতিক বন, পরিযায়ী ও দেশি পাখির নিরাপদ আবাসস্থল। এটি দেশি মাছের অন্যতম প্রজননক্ষেত্র। প্রতিবছর শীত মৌসুমে দেশি ও পরিযায়ী লাখো পাখির মেলা বসে এখানে। দীর্ঘদিন পানির নিচেও টিকে থাকতে পারে এমন কিছু বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে আছে। বিলুপ্তপ্রায় হিজল, করচগাছের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নলখাগড়া, সিঙরা, চাইল্যা, বইল্যা, বনতুলসী, উকল, গুইজ্জাকাঁটা, শালুক ও শাপলা। হাওড়ে ১৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৪১ প্রজাতির মাছ, ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৬ প্রজাতির কচ্ছপ, ৭ প্রজাতির গিরগিটি ও ২১ প্রজাতির সাপ দেখা যায়। অস্তিত্বের হুমকিতে থাকা ২৬ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর আবাসভূমিও এই হাওড়। এখানে দেখা মেলে বিরল প্রজাতির প্যালাসার ফিশ ইগলের। টাঙ্গুয়ার হাওড়ের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হাওড়ের একটি সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন, দাতা সংস্থা এসডির আর্থিক সহায়তায় 'টাঙ্গুয়ার হাওড়ে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা' প্রকল্প পরিচালনা করছে। মূলত শীতকালে হাওড়ে বেড়ানোর উত্তম সময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এলাকার মানুষের সংগ্রামী ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন আর বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে চাইলে বর্ষাই উপযুক্ত সময়। হাওড়টি ভ্রমণের সময় ও আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনায় এক, দুই বা তিনদিনের ভ্রমণসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

যাতায়াত

ঢাকার সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে থেকে প্রতিদিন মামুন ও শ্যামলী পরিবহণ এবং মহাখালী থেকে এনা পরিবহণের বেশ ক'টি ডে-নাইট বাস সরাসরি সুনামগঞ্জ যায়। শহর থেকে সুরমা নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে বৈঠাখালি বা মনিপুর ঘাটে গেলে সেখান থেকে ভোর ৬টা থেকে ও রাত ৮টা পর্যন্ত যে কোনো সময় মোটরসাইকেল বা লেগুনা ভাড়া করে তাহিরপুর যাওয়া যায়। এতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। লেগুনায় তাহিরপুর যেতে চাইলে সুনামগঞ্জ শহরসংলগ্ন সাহেববাড়ি ঘাট দিয়ে মনিপুর ঘাটে যেতে হবে। এতে প্রায় সময় লাগবে ২০ মিনিট। মনিপুর ঘাটে লেগুনা ও মোটরসাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যায়। আর মোটরসাইকেল তাহিরপুর যেতে চাইলে সুনামগঞ্জ শহরসংলগ্ন মল্লিকপুর ঘাট দিয়ে পাঁচ মিনিটে সুরমা নদী পার হয়ে বৈঠাখালি ঘাটে পৌঁছে সেখান থেকে মোটরসাইকেল ভাড়া করে তাহিরপুর যাওয়াটা সহজ। এরপর তাহিরপুর থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে দুই ঘণ্টায় টাঙ্গুয়ার হাওড় যাওয়া যায়। তাহিরপুরে একমাত্র সরকারি ডাকবাংলোতে খুবই সীমিত সুবিধা রয়েছে।

একদিনে হাওড় ভ্রমণের কিছু টিপস

মাছের অভয়াশ্রম ও রুই মাছের জন্য বিখ্যাত রউয়্যা বিলে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, পাখি, সিঙরা ফলসহ জলজ ও বনজ উদ্ভিদের অদ্ভুত মিলনমেলা চোখে পড়ে। গোটা হাওড়ে এটি একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বড় খাল। মাঝের স্বচ্ছ পানির দু'পাশে বিশাল নলখাগড়ার বনের সরু এ খালের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ সবাইকে আনন্দ দেবে। চটাইন্না খাল পার হয়ে উত্তর-পশ্চিমে চটাইন্না বিলের দেখা মিলবে। কালেম, টিটি ও দলপিপি এ বিলের প্রধান পাখি।

এরপর পড়বে রূপাভাই বিল। এটিকেও মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে সরকার। পরের আকর্ষণীয় বিল আসবে লেচুয়ামারা বিল। এ বিলের মধ্যে না ঢোকাই শ্রেয়। এতে পাখিদের বিরক্ত করা হয়। এ বিলের মধ্য দিয়ে নৌকা নিয়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব। বিলের প্রচুর জলজ উদ্ভিদ নৌকা চলাচলে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। দুপুরে সাধারণত হাওড়ে কড়া রোদ পড়ে এবং আবহাওয়াও থাকে তুলনামূলক গরম। এ সময় প্রয়োজনে হাতিরগাতা ক্যাম্পে বিশ্রাম নেয়া যায়। উল্লেখ্য, শুষ্ক মৌসুমে টাঙ্গুয়ার হাওড় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মৎস্য আহরণ ও সুরক্ষার জন্য ক্যাম্প স্থাপন করে থাকে। সেখানেই আধঘণ্টা সময় ব্যয় করে দুপুরে খাওয়া ও বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে। হাতিরগাতা কান্দায় কোনো গাছ নেই। কাজেই যারা টেন্ট আনবেন তাদের জন্য কিছুটা সুবিধা হবে। অথবা যারা হিজল-করচগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে চান তাদের জন্য হাতিরগাতা কান্দায় না গিয়ে গোলাবাড়ি চলে আসাই ভালো। সেক্ষেত্রে নৌকায় লেচুয়ামারা থেকে গোলাবাড়ি আসতে সময় লাগবে ২০ মিনিট। গোলাবাড়িতে কিছু সময় বিশ্রাম ও খাবারের জন্য ৪০ মিনিট সময় মিলবে। বিকালের সময়টা কাটাতে পারবেন গোলাবাড়ি থেকে বাগমারা পর্যন্ত বেড়িয়ে। এজন্য কোনো নৌকার দরকার পড়বে না। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক ট্রেইল এটা। দু'পাশে করচগাছের ঘন বাগান। এক পাশে প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর লেক। উঁচু গাছগুলোতে শত শত পাখি রাত কাটায়। যারা জংলি স্ট্রবেরি কিংবা জংলি গোলাপ দেখতে চান তাদেরকে এ জায়গাটায় আসতে হবে। ঝোপঝাড়ের ভেতর অসংখ্য ক্ষুদে পাখির বিচরণ। বিশেষ করে যারা ওয়াবলার প্রেমিক তাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হবে এ ট্রেইল। তবে সময় মতো ফিরে আসার জন্য এক ঘণ্টার মধ্যে পুরো জায়গাটা ঘুরে ফেলতে হবে। বিকাল ৩টায় গোলাবাড়ি থেকে নৌকায় তাহিরপুরে ফেরার পথ ধরতে হবে। তাহিরপুর ফিরতে ফিরতে প্রায় ৫টা বেজে যাবে।

এরপর তাহিরপুর থেকে লেগুনা বা মোটরসাইকেলে আসতে হবে বৈঠাখালি বা মনি-পুর ঘাটে। সময় লাগবে এক ঘণ্টা। সুরমা নদী পার হয়ে সুনামগঞ্জ শহরে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

টাঙ্গুয়ার হাওড় ভ্রমণকালে পরামর্শ

- ভ্রমণকালে নৌকায় ময়লা আবর্জনা জমিয়ে রাখার জন্য ঝুড়ি রাখতে হবে।
- খাবারের অংশ বা উচ্ছিষ্ট, প্যাকেট, খোসা বা পাত্র হাওড়ের পানিতে ফেলা যাবে না।
- মাইক ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রকারে শব্দ তৈরি করা যাবে না।
- রাতের বেলা অবস্থান করলে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলো তৈরি করা যাবে না।
- পাখি বা বন্যপ্রাণী লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া যাবে না কিংবা অন্য কোনো প্রকারে এদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।
- হওড়ের মাছ, বন্যপ্রাণী বা পাখি ধরা যাবে না বা এদের জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।।
- হাওড়ের কোনো গাছপালা, বন, জঙ্গল বা লতাপাতার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- শামুক, ঝিনুক বা অন্য কোনো প্রকার জলজ বা স্থলজ প্রাণী/কীটপতঙ্গের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- হাওড়ে ভ্রমণকালে হাতেচালিত নৌকার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
- টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ভ্রমণকালে প্রতিটি দর্শনার্থী একজন প্রকৃতিপ্রেমীর মতো বিনা উপদ্রুপে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করবেন- এটাই প্রকৃতিবান্ধব পর্যটনের প্রত্যাশা।

তথ্য সংগ্রহ: আইইউসিএন বাংলাদেশ

সাগর সৈকতে কুয়াকাটা

পদ্মা সেতু হওয়ায় সাগরকন্যা কুয়াকাটার নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। এখন ঢাকাসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অতি সহজেই কুয়াকাটায় যেতে পারবেন। আগের মতো ফেরি পারাপারের ভোগান্তি নেই, কুয়াকাটায় পৌঁছাতে সময়ও কম লাগবে। এ কারণে বাড়বে পর্যটকের সংখ্যা।

সকালবেলায় পূর্ব দিগন্তের জলরাশি ভেদ করে লাল থালার মতো সূর্যোদয়। বিকালে আবার পশ্চিম দিগন্তে একই রূপে পানিতে ডুব দেয়া। একই জায়গা থেকে এরকম সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মনোহর দৃশ্য দেখার বিরল জায়গা এ দেশেই আছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অপার সৌন্দর্যের এই লীলাভূমির নাম কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। এখানকার সমুদ্র সৈকতে আগে যারা কখনো যাননি তারা গিয়ে মুগ্ধ হবেন এই অসীম সৌন্দর্যে। শুধু সমুদ্র সৈকত নয়; এখানে আছে দেখার মতো আরও অনেক জায়গা। কুয়াকাটা নামের উৎস সেই প্রাচীন কূপ দেখতে পাবেন এখানে এলে। সমুদ্র সৈকতের খুব কাছেই রয়েছে এটি। এই কূপের সঙ্গেই রয়েছে একটি বৌদ্ধমন্দির। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। এর কাছেই আছে রাখাইন পল্লী। ঘুরে দেখতে পারেন উপজাতিদের এই এলাকাটি। এখান থেকে পূর্ব দিকে মিশ্রিপাড়ায় রয়েছে আরেকটি বৌদ্ধমন্দির। এই মন্দিরের পাথর নির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মূর্তি। কুয়াকাটা সৈকত ধরে পূর্ব দিকে এগোলে রয়েছে গঙ্গামতির চর। এই জায়গাটি খুবই আকর্ষণীয়। এর আগে রয়েছে গঙ্গামতির বাঁক। সকাল বেলা সূর্যোদয়ের দৃশ্য ভালোভাবে দেখতে হলে আসতে হবে এখানে। কুয়াকাটা সৈকত থেকে এই দুইটি জায়গাতে যেতে পারেন মোটরবাইকে। সাগরের জলরাশিতে বেড়ানোর জন্য লাইফবোট প্রস্তুত থাকে। পাশাপাশি রয়েছে স্পিডবোট ও ওয়াটার বাইক। যে যেটা পছন্দ করেন, সেটাতে উঠে ঘুরতে পারবেন। কুয়াকাটার নিকটবর্তী লেম্বুর চর, ফাতরার চর, গঙ্গামতী, আশার চরে পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি চর বিজয় ভ্রমণ করতে চান, সে ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া সৈকতের পশ্চিম দিকে শুঁটকি পল্লী। ঘুরে আসতে পারেন এই জায়গা থেকেও।

যেভাবে যেতে হবে

ঢাকা থেকে কুয়াকাটা যেতে পারেন সড়কপথ কিংবা জলপথে। তবে পদ্মা সেতু হওয়ায় এখন ঢাকাসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অতি সহজেই কুয়াকাটায় যেতে পারবেন। আগের মতো ফেরি পারাপারের ভোগান্তি নেই, কুয়াকাটায় পৌঁছাতে সময়ও কম লাগবে। পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে সাড়ে ৫-৬ ঘণ্টায় পটুয়াখালী যাওয়া যায়। আগে এই পথ পাড়ি দিতে ফেরি ঘাটেই পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা বসে থাকতে হতো। ঢাকার সায়দাবাদ থেকে সাকুরা পরিবহণ ও আরামবাগ থেকে গ্রিন লাইন পরিবহণের এসি বাস পটুয়াখালী চৌরাস্তায় যায়। এছাড়া কমলাপুর ও গুলিস্তান থেকে বিআরটিসির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস চলাচল করে পটুয়াখালীতে। কেউ চাইলে লঞ্চেও যেতে পারেন। ঢাকার সদরঘাট থেকে লঞ্চে পটুয়াখালী এসে সেখান থেকে বাসে যেতে পারেন কুয়াকাটা।

কোথায় থাকবেন

কুয়াকাটায় অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত হোটেল-মোটেল আছে ৭৪টি। এর বাইরে আছে ৫৬টি হোটেল-মোটেল। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির হোটেল রয়েছে ১৫টির মতো। এতে সর্বোচ্চ ১৫ হাজারের মতো পর্যটক রাত যাপন করতে পারেন। এর মধ্যে ভালো মানের হোটেল হচ্ছে পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেল, পর্যটন হলিডে হোমস্ কুয়াকাটা ও কুয়াকাটা ইয়ুথ ইন। ব্যক্তি মালিকাধীন হোটেলের মধ্যে রয়েছে-বিচ হ্যাভেন, সাগর কন্যা রিসোর্ট লি., হোটেল মোহনা ইন্টারন্যাশনাল লি., কুয়াকাটা গেস্ট হাউজ, হোটেল নীলাঞ্জনা, হোটেল কুয়াকাটা ইন, হোটেল বনানী প্যালেস।

ট্রাভেল টিপস

বাঞ্জি জাম্পিংয়ের পূর্ব প্রস্তুতি

পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

বর্তমানে ভ্রমণপিপাসু ও রোমাঞ্চপ্রেমীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাঞ্জি জাম্পিং। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এখন বাঞ্জি জাম্পিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালও পিছিয়ে এই ক্ষেত্রে।

ইলাস্টিকের দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় সুউচ্চ স্থান থেকে ফাঁকা জায়গায় লাফিয়ে পড়ে রোমাঞ্চের স্বাদ নেয়ার সুযোগ করে দেয় বাঞ্জি জাম্পিং। উঁচু ভবন বা ক্রেন, উপত্যকা বা গিরিখাতের মাঝে থাকা সেতুসহ অনেক জায়গা থেকেই বাঞ্জি জাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত পাহাড় আর পাথুরে স্রোতস্বিনী খাল বা নদীর সংযোগস্থলে বাঞ্জি জাম্প করা গেলে অনুভূতি হয় আরও দুর্দন্ত। অ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেল টিপসে এবারের আলোচনায় বাঞ্জি জাম্পিং। ভাবুন তো! আপনি ঠিক পাখির মতো উড়ছেন কিংবা উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ছেন। বিষয়টা কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর। উঁচু থেকে উল্টো হয়ে পড়ার সময় শরীরে যে শিহরণ জাগবে; তার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সুযোগ থাকলে বিষয়টি উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে খুব কম মানুষই।

বাঞ্জি জাম্পিং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্টান্ট। কথিত আছে, এটি করতে পারার ঘটনা যুদ্ধ জয়ের মতো উত্তেজনার সৃষ্টি করে স্নায়ু। তবে এই স্টান্ট করার আগে অবশ্যই কিছু প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন।

শারীরিকভাবে ফিট থাকা

বাঞ্জি জাম্পিংয়ের জন্য শারীরিকভাবে আপনি ফিট কিনা তা আগে জানতে হবে। কারণ, এই জাম্পের সঙ্গে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি না তা আগে দেখে নেওয়া দরকার। উঁচু থেকে লাফ দেওয়ার ক্ষেত্রে শরীরের ওজন ও বয়সের সীমাবদ্ধতাও আছে। তাই সঠিক নিয়ম জেনে তবেই বাঞ্জি জাম্পিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিন। এছাড়া পিঠ বা ঘাড়ের আঘাত, শরীরের কোথাও ভাঙা থাকলে, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, স্নায়ুর রোগ, মৃগীরোগ, হার্টের অসুখ, এমনকি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাঞ্জি জাম্প এড়িয়ে চলা উচিত।

পরিমিত খাবার গ্রহণ

বাঞ্জি জাম্পিংয়ের প্রস্তুতির আগে খাবার গ্রহণে কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। এক্ষেত্রে খাবার খেতে হবে পরিমাণ মতো। অতিরিক্ত কিংবা একেবারেই কম খাওয়া ক্ষতিকর। অ্যালকোহল বা ইন্দ্রিয় নিস্তেজ করে এমন কোনো ওষুধ সেবন করলে বাঞ্জি জাম্প এড়িয়ে চলাই ভালো।

খোঁজ নিতে হবে আগে থেকেই

বাঞ্জি জাম্পিংয়ের আগে কিছুটা হোমওয়ার্ক করতে পারেন। ঠিক কোন স্থানে আপনি এই স্টান্ট করবেন সেখানকার খোঁজখবর নিন। পাশাপাশি প্রশিক্ষিত জাম্প মাস্টার, বিমা ও সার্টিফিকেশন কেমন আছে, তাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখবেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করা একবারেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পোশাক নির্বাচনে গুরুত্ব

বাঞ্জি জাম্পিংয়ে পোশাক নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক্ষেত্রে প্যান্ট বা শর্টস পরাই সবচেয়ে ভালো। শরীরের সঙ্গে লেগে থাকবে এমন পোশাক পরতে হবে। শরীরের বাইরে থেকে উড়তে থাকে এমন পোশাক এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মানতে হবে বিশেষ সর্তকতা। যদি জুতা পরেন তাহলে তা যেন ঢিলেঢালা না হয়। তবে এক্ষেত্রে খালি পায়ে থাকাই উত্তম। এছাড়া পকেট যেন অবশ্যই খালি থাকে সেদিকেও রাখতে হবে বিশেষ সর্তকতা।

দুশ্চিন্তা করবেন না

প্রথমবার বাঞ্জি জাম্পিংয়ের সময় সবাই উদ্বেগ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তবে ভয় পেলে কিংবা দ্বিধা থাকলে সময় থাকতেই বাঞ্জি জাম্পিংয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুন। আর যদি করতেই চান তাহলে মনে সাহস রাখুন ও গভীর শ্বাস নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসুন।

চাঁদপুরের মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্র

মেঘনার তীরে সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি

শাহনাজ পারভীন এলিস

বালুকাময় নদীতীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র সৈকতের আবহ, তপ্ত দুপুরে খোলা আকাশের নিচে নদীতে সূর্যের ঝলকানি, আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার অপূর্ব সুযোগ- এসবই উপভোগ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে চাঁদপুরের মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্রে। এ যেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের একখণ্ড প্রতিচ্ছবি। চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় মেঘনা নদীতীরে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের আদলে গড়ে উঠা এ পর্যটনকেন্দ্রে প্রতিদিনই ভিড় করছেন ভ্রমণপিয়াসী দর্শনার্থী। মোহনপুর গ্রামের লঞ্চঘাট এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মিঠাপানির এ সৈকত এরই মধ্যে 'মিনি কক্সবাজার' হিসেবে সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং বিশেষ দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড়ে সরগরম থাকে গোটা এলাকা। সব বয়সী নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের আনাগোনায় তৈরি হয় প্রাণের উচ্ছ্বাস। দর্শনার্থীদের কেউ কেউ বালুময় মেঘনার তীরে শরীর গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কেউবা নদীতে নেমে জলকেলি করছেন। সেলফি তুলেও সময় কাটাচ্ছেন অনেকে। পার্কে দোলনায় মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে শিশুরা। রাইডে উঠেও হইহুল্লোড় করছে তারা। কেউবা আবার বিনোদন কেন্দ্রের পাশে গড়ে উঠা মার্কেটে কেনাকাটায় ব্যস্ত। বিনোদনের এ অনিন্দ্যসুন্দর কেন্দ্রটিতে এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত পর্যটকরা যেন খুঁজছেন একটু স্বস্তি ও নির্মল আনন্দ।

যেসব সুবিধা রয়েছে পর্যটনকেন্দ্রটিতে

নদীতীরের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় শতাধিক বিচ বেড বসানো হয়েছে। রয়েছে খোলা মাঠ ও বালু প্রান্তর। মাঠের পাশে রয়েছে চটপটি-ফুচকা, আচার, চকলেট, চা ও মুড়ি বিক্রেতার ছোট-বড় দোকান। নদীতে নৌকা ভ্রমণ, রিভার ড্রাইভ স্পিডবোট, সুইমিংপুলসহ খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাঁচ হাজার আসনের উন্মুক্ত মঞ্চ। কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য রয়েছে সুন্দর রাস্তা, দু'পাশে ও মাঝখানে ফুলের বাগান। এছাড়া শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন রাইড সম্বলিত মিনি থিম পার্ক, মিনি চিড়িয়াখানা, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হাঁটা ও বসার ব্যবস্থা এবং পুরো এলাকাজুড়ে রয়েছে রকমারি গাছপালা ও বনবনানী।

পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার্থে এখানে 'শিপ ইন' নামে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি আধুনিক রেস্টুরেন্ট ও পাঁচটি উন্নতমানের কটেজ রয়েছে। রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে ৫০০ থেকে ৬০০ পর্যটক বসে বুফে এবং বারবিকিউ আইটেমের খাবার খেতে পারবেন। রেস্টুরেন্টের মেন্যুতে বাংলা, চায়নিজ, ভারতীয়, ইউরোপীয় ও কন্টিনেন্টালসহ প্রায় সব ধরনের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। সন্ধ্যার পর পুরো এলাকায় রয়েছে সুদৃশ্য আলোর ব্যবস্থা। পর্যটনকেন্দ্রের ভেতরে রয়েছে অত্যাধুনিক মার্কেট, ওয়াচ টাওয়ার ও দূরপাল্লার লঞ্চের জন্য পন্টুনের ব্যবস্থা। এখানে ড্রোন উড়ানোর ব্যবস্থাও আছে।

দর্শনার্থীর অনুভূতি

সম্প্রতি মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্রে পরিবার নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক আকতারুজ্জামান। তিনি তার এক সহকর্মীর মাধ্যমে পর্যটনকেন্দ্রটির খবর পান। জানান, স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে মোহনপুরে গিয়ে কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ তাদের বেশ ভালো লেগেছে। বিশেষ করে নদীর তীরে বসার সুব্যবস্থা, কক্সবাজারের মতোই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ। কটেজের সঙ্গেই রয়েছে সুইমিংপুল। শিপ ইন রেস্টুরেন্টর পরিবেশটাও বেশ গোছালো, বসার ও খাবারের ব্যবস্থাপনাও ভালো। এছাড়া নদীতে স্পিডবোটে ঘোরার ব্যবস্থা, কেন্দ্রের ভেতরে বাচ্চাদের জন্য বিনোদন কর্নার, সৌদি আরবের খেজুর বাগান ও বাহারি ফুলের বাগান তাদের খুব ভালো লেগেছে। বাচ্চারাও খুব এনজয় করেছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনার মান অনুযায়ী খরচটাও মধ্যবিত্তের আওতার মধ্যে।

টিকিট কাউন্টার ও কার পার্কিং

পর্যটনকেন্দ্রের প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরের বাম পাশেই রয়েছে টিকিট কাউন্টার। জনপ্রতি প্রবেশ ফি ১০০ টাকা। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে কেন্দ্রের ভেতর প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য রয়েছে আলাদা গেটের ব্যবস্থা। নদীর পাড়ঘেঁষে ছাতা চেয়ারের জন্যও রয়েছে টিকিট। ২ জন একসঙ্গে বা ১ জনের জন্য প্রতি ছাতা চেয়ারের ভাড়া ঘণ্টাপ্রতি ৩০ টাকা। অনেকটা কক্সবাজারের মতোই। কার পার্কিংয়ের জন্য কেন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে রয়েছে বিশাল জায়গা। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ফি আগে জমা দিয়ে একটি টোকেন নিতে হবে। আবার চলে যাওবার সময় সেই টোকেন দেখিয়েই গাড়ি নিতে হবে। এখানে টোকেন ফি আগেই দিতে হয়।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. মিজানুর রহমান জানান, প্রায় ১৫ বছর আগে মেঘনা নদীকে ঘিরে এ পর্যটনকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা করি। প্রায় ৬০ একর জমির ওপর ২০২০ সালে পর্যটনকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়। তিনি জানান, প্রথম দিকে চাঁদপুর ও আশপাশের জেলার ভ্রমণপিপাসু লোকজনের বিনোদনের কথা ভেবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের আদলে এটি তৈরি করা হয়। মেঘনার পাড়ে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এ বিনোদনকেন্দ্রের সৈকতে উন্নতমানের কৃত্রিম বালু বসানো হয়েছে। পরে এটিকে পরিণত করা হয় মাল্টিপল পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে। এখানে রয়েছে সার্বক্ষণিক তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কম খরচে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দিনে এসে দিনেই ফিরে যেতে পারছেন পর্যটকরা। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে পর্যটককেন্দ্রটি।

কীভাবে যাবেন মোহনপুর

ঢাকা থেকে নৌ ও সড়কপথ- দু'ভাবেই চাঁদপুরের মোহনপুরে যাওয়া যায়। নৌপথে যেতে হলে ঢাকার গুলিস্তান থেকে উৎসব বা বন্ধন পরিবহণের বাসে নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে।
ভাড়া নেবে ৩৫ টাকা। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশের জন্য জনপ্রতি ১০ টাকা দিতে হবে। সেখান থেকে চাঁদপুর বা মতলবের উদ্দেশে বেশ ক'টি লঞ্চ ছেড়ে যায়। যেগুলো মোহনপুর লঞ্চঘাট হয়ে যাবে আপনাকে সেটাতে উঠতে হবে।
লঞ্চে বিলাসের ভাড়া জনপ্রতি ৯০ টাকা। লঞ্চে মোহনপুর পৌঁছতে ২ থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে।
আর সড়কপথে ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে কুমিল্লাগামী বাসে দাউদকান্দি যেতে হবে। ভাড়া ৬০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। তবে বাসে উঠার আগে ভাড়া নির্ধারণ করে নেয়া ভালো। দাউদকান্দি নেমে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যাবেন সিরারচর।
ভাড়া নেবে ৫০ টাকার মতো। সেখান থাকে আবার অটোতে মতলবে যেতে ভাড়া লাগবে ৪০ থেকে ৬০ টাকা।
এরপর মতলব থেকে অটো বা মোটরসাইকেলে মোহনপুর পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ভাড়া নেবে ৫০ থেকে ১৫০ টাকা।

যোগাযোগ

মোহনপুর পর্যটন লিমিটেড, হটলাইন: ০১৮৯৩৪৪৮০৮০, ফুড ম্যানেজার: ০১৮৯৩৪৪৮০৮০, ০১৬১৫০১২৮০২

পর্যটন উৎসব

লোকউৎসবের ‘ভাদ্র-আশ্বিন’

ইমরান উজ-জামান

ভদ্রা নক্ষত্রের ঔরসজাত শুভ্র কাশ ফোটা ভাদ্র আর নক্ষত্রের কক্ষপথে চন্দ্রযোগ আশ্বিন। অন্য কথায় বর্ষার ভরা ভাদর আর ব্রত-পার্বণের আশ্বিন মাস। ফসলি জনগোষ্ঠীর উৎসবকাল। বর্ষার মাস কেটে যেতেই ভদ্র ছুটে আসে। পাকা তালের রসে তৈরি হরেক রকম খাবার। লোকে বলে- ‘ভদ্র মাসে খাওয়া চাই তাল। নইলে পরে জুটবে নাকো অন্ন-নুনে ডাল’।

সনাতন হিন্দুধর্মে বর্ণিত নবগ্রহদের রাজা হলেন শনিদেব। স্কন্দ পুরাণে শনি দেবতার জন্ম ভদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে বলে উল্লেখ আছে। শনিদেবের পছন্দের ফল নাকি তাল। ভদ্রমাসের ফল, সুস্বাদু ও লোভনীয় ফল ‘ভদ্রফল’ তাল। তামিল ভাষায় তালের গাছকে বলা হয়- ‘কাঠপাহাতরু’। মানে দৈব্য গাছ। দৈব্য ফল পাকার মাসও দৈব্য।

সদ্য পাট বেচা টাকা, অঞ্চলভেদে আখের মাড়াই মৌসুম আখ বিক্রির টাকা। ভাদরে বর্ষার পানি সরে যেতে থাকে, জেগে উঠতে থাকে ফসলের চাষযোগ্য জমি। সেই জমিতে লাঙল চালিয়ে তৈরি হয় চাষের জমি। আশ্বিনে শুরু হয় শীতের ফসল বোনা। বীজতলায় বাড়ন্ত ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো।

বারমাসে তেরো পার্বণের দেশে ‘ভাদর কাটানি’ একটি প্রচলিত সামাজিক উৎসব। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুরে হয়ে থাকে এই ভাদর কাটানি। পহেলা ভদ্র থেকে শুরু হয় নববধূর বাবার বাড়ি নাইওর যাওয়া। কমপক্ষে ১৫ দিন পর্যন্ত স্বামীর মঙ্গল কামনায় নতুন বধূ তার স্বামীর মুখ দর্শন করবেন না। এ কারণে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকেন। এটাই হলো ভাদর কাটানি উৎসব। কোনো ব্যাখা বা যুক্তি না থাকলেও উত্তরাঞ্চলে এটি আদি প্রথা; যা যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি সামাজিক উৎসব।

নানা পার্বণ তো বটেই, নানা লোকবিশ্বাসে ভরা এই বাংলা। ভদ্র মাসে নানা ধরনের অসুখ বিসুখ লেগে থাকে। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও টোটকা ভদ্র মাসে মামির হাতে ভাত খেতে হয়। লোক প্রচলন হলো, ভদ্র মাসে মামির হাতে ভাত খেলে বাকি ১১ মাস ভালো থাকা যায়। এখনো ভাগনেরা মামার বাড়ি গিয়ে মামির হাতে ভাত খায়।

ভদ্র মাসের আরেক পার্বণ ‘আখা-পালনী’। পাথরে পাথর ঠুকে জ্বালানো আগুন ছিল মানব সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার, আগুন অতি পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় মানবকুলের জন্য। শুধু আগুন কেন, এই আগুন ব্যবহার করতে যে উনুন ব্যবহার করা হয়, সেই উনুন কি কম পবিত্র, কম পূজ্য। উনুনেই যে হয় রোজকার ভোজাহার। এই উনুনকে স্মরণ বা সম্মান দেয়াই ‘আখা-পালনী’। আখা মানে উনুন। ভদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে উনুনে আগুন না জ্বালিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, উনুনের ভেতর ধানগাছ ও কচু রেখে, সিঁদুরের তিনটি ফোঁটা দেয়া হয়। আলপনা দিয়ে সাজানো হয়। পার্বণের দিন বাড়িতে উনুন জ্বলে না ঠিকই, তবে তার আগের দিনে সেরে নেওয়া হয় সমস্ত রান্নাবান্না। পরদিন বাড়ির মেয়ে-বৌরা উনুন থেকে ধান-কচুগাছ তুলে পুকুরে বিসর্জন দেয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ‘আখা পালনী’।

সনাতন সমাজে আরেক পার্বণ ‘ঝুলন যাত্রা’। ঝুলন পূর্ণিমাকে শ্রাবণী পূর্ণিমাও বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের উৎসব ঝুলন যাত্রা। শ্রাবণ মাসে একাদশী থেকে পূর্ণিমা, এই পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব ঝুলন উৎসব। শাস্ত্রমতে, বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণর প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরযুগে এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সবাইকে অনুগ্রহ করবার জন্য গোলকধাম থেকে ভূলোকে এসে লীলা করেন। ঝুলন শব্দটির সঙ্গে ‘দোলনা’ শব্দটি রয়েছে। তাই এই সময় ভক্তরা রাধা-কৃষ্ণকে দোলনাতে বসিয়ে আরাধনা দেয়।

ঝুলনে নানা আচার অনুষ্ঠান ও সাবেক প্রথার সম্মেলন ঘটে। মাটির পুতুল, কাঠের দোলনা আর গাছপালা দিয়ে ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ ছোটদের মধ্যেও রয়েছে। কোথাও কোথাও ঝুলন উপলক্ষে চলে নামসংকীর্তন। ২৫-৩০ রকমের ফলের নৈবেদ্য, লুচি, সুজি নিবেদন করা হয় প্রতিদিন। মৌলভীবাজার কমলগঞ্জে হয় উল্লেখ করার মতো ঝুলন মেলা।

ভাদ্রের শুরুতে পানি প্রধান সাপ-খোপ অধ্যুষিত এলাকায় মনসা বন্দনা হয়ে থাকে। মূলত পাহাড়ি জনপদ সিলেট-মৌলভীবাজার-রাঙামাটি-বান্দরবান বিশেষ করে চা বাগানে বিষহরি বন্দনা হয়ে থাকে। সমুদ্র ও নদী প্রধান অঞ্চলে সর্প বন্দনাকে বলা হয় মনসা বন্দনা। বরিশাল-কুয়াকাটা-খুলনা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজারে হয় মনসা বন্দনা। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার জেলে সম্প্রদায়ে মনসা বন্দনার দিন পাল্টামনসা বলে এক রকমের কবিগানের প্রচলন আছে। টাঙ্গাইল-জামালপুরে হয় ভাসান গান বা বেহুলার ভাসান। এই গান মুসলিম ওঝা শ্রেণি করে থাকে, তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষও দলে থাকে। ভাসান গান মূলত পদ্মপুরাণের সংক্ষিপ্ত রূপ।

শ্রাবণ মাসের শেষ দিন অথবা ভদ্র মাসের প্রথম দিন খুব সকালে দলের চরিত্রগুলোর সাজসজ্জা শেষে সাজানো নৌকায় উঠে বসে দলপতি। যমুনার বুকে নৌকা চলতে চলতে নৃত্যগীত চলতে থাকে। পথে সাত ঘাটে ভিড়তে হয়, ঘাটের পাশের বাড়ির উঠানে চলে ধারাবাহিক পরিবেশনা। দিন শেষে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া দুধ, কলা, জবা ফুলসহ ঢালা যমুনার পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে সম্পন্ন হয় ভাসান গান।

আছে ‘ভেলা ভাসানি’ ভদ্র মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকা-বিক্রমপুর ও আশাপাশের এলাকায় হয় ভেলা ভাসানি। মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের পীর ভক্তকুল পানির মালিক খোয়াজ-খিজির বা খিজির পীরের উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসিয়ে থাকেন। কলা গাছ দিয়ে ভিটি তৈরি করে, সেই ভিটিতে বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়। সারাদিন চলে ঘর বানানোর কাজ, রঙিন কাগজ কেটে ভেলা

সাজানোর কাজ। ভক্তকুল মোরগ-খাসি-গরু-চাল-ডাল-টাকা-পয়সা নিয়ে হাজির হন। বড় বড় ডেকচিতে খিচুরি রান্না হয়, দিনমান চলে খিচুরি খাওয়া।

আসরের পর থেকে শুরু হয় ভেলা ভাসানোর প্রস্তুতি। ফুল-ধান-দূর্বা দিয়ে ভেলার তৈরি সম্পন্ন করা হয়। ভেলায় রাখা হয় মানতের টাকা-পয়সা-ফলমূল-পায়েস। এই পুরো সময় ব্যান্ডপার্টি বাজে বাড়িতে। শেষে ভেলা নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে। নদীতে ভেলা ভাসানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভেলা ভাসানি উৎসব। ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার হয় বড় ভেলা ভাসানি। চাঁদপুরের বেলতলির লেংটার মাজারে হয় সর্ববৃহৎ ভেলা ভাসানি। মুন্সীগঞ্জের মনাই পাগলার মাজারে ও প্রমাণ আকারের ভেলা ভাসানো হয়।

ভাদ্র-আশ্বিনে মধুপুরসহ গারো পাহাড়ে হয় ওয়ান্না বা ওয়ানগালা। তিনদিনের ওয়ান্নায় প্রকৃতিকে পবিত্র করে তোলা গারোদের ওয়ান্নার প্রধান বিষয়। ওয়ান্নাতে গারো বা মান্দি জনগোষ্ঠী নতুন ফসল তোলার পর শস্য দেবতা 'মিশি শালজং'কে ধন্যবাদ জানায়। বাঁশ দিয়ে তৈরি গারোদের দেবতা রাক্কাসিকে চ্যু আর দ্যু (মদ ও মোরগ) দিয়ে পবিত্র করে তোলা হয়। আর এই কাজটি করে মান্দিদের সাংসারেক ধর্মীয় গুরু খামাল।

ভাদ্রের মাঝামাঝি মাগুরার সাতদোহাতে হয় সাতদোহা মেলা। ভদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ যশোরের চৌগাছিতে হয় বলু দেওয়ান ফকিরের মেলা। এ মেলা দুটো সমসাময়িক মেলার মতোই মাজার কেন্দ্রিক। লোক সমাগম হয় খুব। আছে সনাতন ধর্মের শেষ দিন বিশ্বকর্মার স্মরণ পার্বণ। আশ্বিন মাসের প্রথম দিন সাতক্ষীরায় হয় গুড়পুকুরের মেলা। মূলত মনসা বন্দনা এই গুড়পুকুরের মেলা। সাতক্ষীরা শহরের গুড়পুকুর পাড়ের শতবর্ষী বটবৃক্ষতলে সকাল থেকেই জড়ো হয় মনসা ভক্তরা। বটতলাকে মানুষ মনসাতলা বলে। মনসাতলাকে কেন্দ্র করে দুধ-কলা-জবা ফুল-দূর্বার বাজার বসে। দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ দুধ-কলা নিয়ে মনসাতলায় প্রণামী দেয়। মনসাতলার আশপাশে বেহুলার গান বসে। বিধবা নারীদের বেহুলার গান একমাত্র সাতক্ষীরাতেই দেখা যায়। গান করে প্রণামী নেয় নারী বেহালার গানের শিল্পী দল। দিন শেষে মনসাতলা শূন্য পড়ে থাকে।

এছাড়া আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে হয় প্রবারণা পূর্ণিমা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধপূর্ণিমা, মহাম-হিমান্বিত দিন। তারা এই দিন ফানুস ওড়ায় আকাশে। পূণ্য অর্জনে বিধাতার কাছে সবিনয় নিবেদন পাঠায়। রামু-কক্সবাজারে বড় প্রবারণা হয়, ঢাকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতেও ফানুস ওড়ানো হয়। প্রবারণার পরের দিন হয় বৌদ্ধদের জাহাজ ভাসানি। রামু-কক্সবাজারে এই জাহাজ ভাসানি হয়। সারাদেশে এ মাসেই বসে দুর্গাপূজার মেলা। সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্ত নদীতে দশমির দিন বসে বিসর্জনের মেলা।

আছে দুর্গাপূজার মেলা। সারাদেশে হয় দুর্গাপূজার মেলা। বিজয়া দশমীর বিসর্জনের দিন অভিনব অতি সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয় সাতক্ষীরার দেবহাটায় ভারত সীমান্তের ইছামতি নদীতে। সেদিন দুই দেশের প্রতিমা বিসর্জন একই সময়ে একই নদীর দুই পাড়ে থেকে নৌকায় নৌকায় ভরে যায় ইছামতি নদী।

সামাজিকতায় আশ্বিনের শেষে এক ভিন্ন মাত্রার উৎসব গারু হারকাইন। গ্রামবাংলায় সনাতন হিন্দু ধর্মে একে গারু হারকাইন বললেও মুসলমান সম্প্রদায় বলে আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়। আশ্বিন মাসের শেষদিন ভাত-তরকারি রান্না করে রেখে দেয়া হয়। রাতে নিমপাতা-হলুদ-গিলা-মেথি-মেহেদি বেটে রান্নাঘরের চালের ওপর রেখে দেয়া হয়। ছিলে রাখা আখের খণ্ড দিয়ে মালা, মুড়ি দিয়ে মালা গেঁথে রাখা হয়। মুড়ির মোয়া, খেয়ের মোয়া, গুড় দিয়ে জুলুপ দেয়া শুকনো শালুক। কুলাতে রাখা নিমপাতা-কাচা হলুদ, লোহার পেরেক, বেতের ডাটি, ধান, দূর্বা রাখা হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেরা এবং ঘরের ছোটদের গায়ে বাটা নিমপাতা-হলুদ-গিলা-মেথি-মেহেদি শরীরে মেখে গোসল করানো হয়। এরপর উঠানে বসে কুলাতে রাখা বেতের ডাটি, পেরেক, কাচা হলুদে কামড় দেয়া হয়। এবার গলায় আখের ও মুড়ির মালা ঝুলিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে হয়। সবশেষ গতকাল রান্না করে রাখা ভাত-তরকারি খাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'আশ্বিনে রান্দি কার্তিকে খাই'।

এক আনন্দ আর মেলা-পার্বণের মধ্য দিয়ে দুই মাস অতিবাহিত করে বাংলার মানুষ।

বাংলাদেশ যে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'- এর দেশ তার প্রমাণ এসব মেলা-পার্বণ। এসব অনুষ্ঠানকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা বললে ভুল হবে। এসব পার্বণ সমাজের মানুষে মানুষে সংযুক্তি বাড়ায়। মানুষের মননের বিনোদন জোগায়। সব শেণি-পেশা-বয়সি মানুষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হয়। বাংলাদেশটাই এক আনন্দলোক, উৎসবের জনপদ।

লেখক : সাংবাদিক ও পরিব্রাজক

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের মনোহর দৃশ্য

আমার অহং ভাঙার বাহন

ড. মো. আনিসুর রহমান

আমরা ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত যখন পিরোজপুরে ছিলাম তখন আব্বা রাশিয়ান একটা সাইকেলে চড়ে বাসা থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন। প্রাইমারিতে পড়াকালীন আমাদের দুই ভাইয়ের একজন আব্বার সাইকেলের সামনে রডে বসে এবং অন্যজন পেছনে কেরিয়ারে বসে স্কুলে যেতাম। এই সাইকেলটাই আমি চালানো শিখেছি ১৯৮১ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময়। আমার উচ্চতার তুলনায় এটার উচ্চতা বেশি ছিল বলে প্রথমদিকে এক বগলের নিচে সিট রেখে অন্য হাতে হ্যান্ডেল ধরে, এক পা সাইকেলের বডির ভেতর দিয়ে অন্য প্রান্তের প্যাডেলের ওপর রেখে বেশ কসরত করে চালাতাম। পরের শ্রেণিতে উঠে যখন সিটে বসে চালাতে শিখলাম তখনও দুই পা একই সঙ্গে প্যাডেলের নাগাল পেত না। এক পা দিয়ে প্যাডেলে যখন চাপ দিতাম তখন অন্য পা শুন্যে উঠে যেত। অবশ্য সিট থেকে শরীর রডের ওপর নামিয়ে এনে দাঁড়িয়ে চালালে দুই পা একই সঙ্গে প্যাডেলের নাগাল পেত।

তখন পিরোজপুরের অধিকাংশ রাস্তা ছিল ইট বিছানো। তবু 'শহর ছাড়া রাঙা ইটের ওই অমসৃণ' পথগুলোই মন ভোলাত। সেইসব পথ ধরে শহরের যে কোনো দিকে ২/৩ কি.মি সাইকেল চালিয়ে গেলেই দুপাশে ধানক্ষেত আর নদী-নালা যখন চোখে পড়ত, তখন সব অবসাদ দূর হয়ে মনটা সতেজ হয়ে উঠত। কলেজজীবন পর্যন্ত একদিনে ২০ কি.মির বেশি চালাইনি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় হলে ছিলাম বলে সাইক্লিংয়ে ভাটা পড়ে। ১৯৯৫ সালে লেকচারার হিসেবে নিয়োগপাপ্তির পর সাইক্লিং পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। সমাজে চলমান ভুল ধারণায় চালিত হয়ে আমিও ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদমর্যাদার সঙ্গে সাইক্লিং যায় না!

সেই ভুল ভাঙল যখন ১৯৯৮ সালে MSc করতে ব্যাংককের AIT-তে গেলাম। সেখানে ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে প্রফেসর পর্যন্ত সবাই সাইকেল চালাতেন। একজন ছাত্র বা ছাত্রী AIT-তে ভর্তি হওয়ার পর তার অন্যতম প্রথম কাজ ছিল হাজার চারেক বাথ দিয়ে একটা সাইকেল কিনে ফেলা। আর সাইক্লিং আগে শেখা না থাকলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শিখে নেয়া। ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ভবনে হত, যে ভবনগুলো আবার সব সময় কাছাকাছি নয়। প্রত্যেক ভবনের সামনেই সুশৃংখলভাবে সাইকেল রাখার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি তলায় তিনজন ছাত্র বা ছাত্রী থাকতে পারে এমন দ্বিতল ভবনে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকতো। এরকম কয়েকটি ভবনের সমষ্টি অভিহিত হতো ভিলেজ নামে। যেমন– ভিলেজ-১, ভিলেজ-২, ভিলেজ-৩ ইত্যাদি। আমরা এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যাওয়ার জন্য বিকালে বেড়ানোর জন্য, বাজার করার জন্য সাইকেল ব্যবহার করতাম। পুরো ক্যাম্পাসটাই ছিল সাইকেলবান্ধব।

প্রফেসরদের সাইকেল চালানো দেখে দেখে শিখে নিলাম- যে কোনো বয়সী বা যে কোনো পদমর্যাদাধারীর জন্য সাইকেল সমানভাবে এক শরীরবান্ধব আনন্দময় বাহন।

২০০০ সালে MSc এর একটা টার্ম জার্মানির TU-Dresden বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ড্রেসডেনে মাত্র মাস চারেক ছিলাম বলে সেখানে সাইকেল কিনি নাই। তবে এক বন্ধুর একটা গিয়ার ওয়ালা সাইকেল ধার করে চালাতাম। জীবনে ওই প্রথম গিয়ার ওয়ালা সাইকেল চালানো। এলবে নদীর তী ঘেঁষে গিয়ার ওয়ালা সাইকেল চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হতো রাজা! ওখানেও আমাদের সুপারভাইজার ষাটোর্ধ প্রফেসর রাসেলকে মাঝে মাঝে সাইকেলযোগে বাসা থেকে কর্মস্থলে আসতে দেখেছি।

২০০৩ সালে কানাডায় Ottawa University-তে পিএইচডি করতে গিয়েছি। বছরের একটা বড় অংশ তুষারপাত হয় বলে সেখানে রাস্তাঘাট মাত্র ৪/৫ মাসের জন্য সাইক্লিংয়ের উপযোগী থাকে। তবুও প্রত্যেক রাস্তায় একটা লেন নির্দিষ্ট থাকে সাইক্লিংয়ের জন্য। গ্রীষ্মকালে শনিবার দিনগুলোতে অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র বাড়ির সামনে মানুষ খুব কম দামে বিক্রি করে। একে বলে গ্যারেজ সেল। একটা সাইকেল মাত্র ২০ ডলার দিয়ে কিনেছিলাম গ্যারেজ সেল থেকে। নতুন কিনতে গেলে ওটার দাম পড়ত ৩০০ ডলার। টপ গিয়ারে চিকন চাকার ওই রোড বাইকটা অনেক জোরে চলত। চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত একটা ভ্যালিতে অটোয়া নদীর পাড়ে অটোয়া শহর অবস্থিত। বেশকিছু জঙ্গলও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এসব পাহাড়-নদী-জঙ্গলের মধ্যে সাইক্লিং করার জন্য অনেক ট্রেইল আছে। ট্রেইলগুলো দিয়ে আমার 'পঙ্খীরাজ'টা চালিয়ে বেড়ানোকালীন নিজেকে মনে হতো দ্বিগবিজয়ে বের হওয়া কোনো অশ্বারোহী সেনা! সে সময়েই আমি মনে মনে পরিকল্পনা করেছিলাম যে, ডিগ্রি শেষে দেশে ফিরে একটা ভালো সাইকেল কিনব। প্রসঙ্গত কানাডার প্রধানমন্ত্রীও মাঝে মাঝে তার বাসভবন থেকে সংসদ ভবনে যান সাইকেলে চড়ে!

২০১০ সালে কানাডা থেকে পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরলাম। সোবহানী ভাইয়ের কাছে শুনলাম উনি মাস ছয়েক আগে একটা রোড বাইক কিনেছেন। কিন্তু সেটা চালিয়ে মজা পাচ্ছেন না। তাই ওটা বিক্রি করে দিয়ে একটা মাউন্টেইন বাইক কিনবেন। কানাডায় আমার রোড বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল, তাই আমি উনার রোড বাইকটা কিনে নিলাম এবং নিয়মিত চালাতে শুরু করলাম। অফিস রুমে আমার একাধিক সেট পোশাক থাকত। সাইক্লিং করে ঘেমে গেলে ভার্সিটির পুকুরে বা ডিসিপ্লিনের বাথরুমে স্নান সেরে পোশাক পাল্টে নিতাম। প্রথম দিকে ক্যাম্পাসে সাইকেল চালাতাম শুধু আমি আর সোবহানী ভাই। ২০১১ সালে প্রফেসর হওয়ার পর একাডেমিক ভবনে একদিন সাইকেল রাখছি, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিরাপত্তারক্ষী কাছে এসে বলল-

- স্যার, একটা কথা বলব?
- বলেন
- কিছু মনে করবেন না তো?
- না
- স্যার আপনাকে সাইকেল চালানো মানায় না। একটা গাড়ি অথবা অন্তত একটা মোটর সাইকেল কিনেন।

- আমি গাড়ি থেকে নামলে আমার কাছে এসে এরকম আপন ভেবে কথা বলতে পারতেন?
- না, স্যার। তবুও...
- শুনেন, আমি টাকা বাচানোর জন্য সাইকেল চালাই না। প্রথমত এটা চালিয়ে আমি অনেক আনন্দ পাই। দ্বিতীয়ত এতে আমার যে ব্যায়াম হয় তা শরীর সুস্থ রাখে। তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ির সময় সূচির ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয় না; যা আমার স্বাধীনতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি এটা চালানোর সময় আমি নিজেকে স্মরণ করাতে পারি যে, একজন রিকশাওয়ালার সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নাই। এরকম আরও অনেক সুবিধা আছে বুঝলেন?
- তাইলে স্যার ঠিকই আছে।

আমার বয়স ৫০ ছুঁইছুঁই। এখনো দিনে ১২০/১৩০ কিমি সাইকেল চালানোর তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন। জীবনের নিয়ম মেনে এই ক্ষমতা দিন দিন কমতে থাকবে। কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে নিরহংকার থাকার ক্ষমতা যেন বিন্দুমাত্র না কমে- মহান আল্লাহর কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।

লেখক : অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহ্যের নৌভ্রমণ

সময় পবির্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার ধরন পাল্টেছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের পর হালের বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নদীপথই ছিল প্রধান। ওই সময় নদীপথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন লেখক আকতারুজ্জামান কামাল। কলামিস্ট, বন্যপ্রাণী ও ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ এই মানুষটি আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। তার 'ঐতিহ্যের নৌ ভ্রমণ' লেখাটি ২০০৫ সালে **পর্যটন বিচিত্রার** সূচনা সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল। প্রয়াত এই লেখকের স্মরণে তার ভ্রমণ কাহিনিটি আবার প্রকাশ করা হলো

আকতারুজ্জামান কামাল

কুয়াকাটা সি-বিচের নাম সে সময় খুব বেশি পরিচিত হয়ে উঠেনি। কিন্তু দক্ষিণ বাংলার পটুয়াখালীর সর্ব দক্ষিণে নদী-খাল বেষ্টিত দুর্গম অঞ্চলের যাতায়াতের হদিস কেউ সঠিকভাবে দিতে সমর্থ হলো না। পর্যটন করপোরেশনের তালিকায় তখন পর্যন্ত কুয়াকাটার কোনো নামগন্ধই ছিল না। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর ঠিক হলো রকেট স্টিমারে বরিশাল পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকে গাড়ি ব্যবস্থা করে পটুয়াখালী পৌঁছানো। তারপর কুয়াকাটা খুঁজে নিতে আর কতক্ষণ? একবার দরজা খুঁজে পেলে চৌকাঠ ডিঙাতে কেউ ভাবে না। ঢাকার সদরঘাট থেকে সরাসরি লঞ্চে পটুয়াখালী পৌঁছানো যায়। কিন্তু লঞ্চের ফার্স্ট-ক্লাস কেবিনের সুরতহাল দেখে রেজা ভাই ও নান্টু দুজনেই নদীপথে লঞ্চে ২৫-৩০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। তাই বলে চাওয়ামাত্র রকেট স্টিমারের ফার্স্ট-ক্লাসের টিকিট পাওয়া কি চাট্টিখানা কথা! কমপক্ষে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই বুকিং করে না রাখলে রকেট স্টিমারের কেবিন পাওয়া যায় না। আবার ভালো স্টিমারে কেবিন পেতে হলে কবে কোন স্টিমার ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে- এসব তথ্য জেনে নিয়ে তবে বুকিং করতে হবে। না হলে কেবিন পেলেও পস্তাতে হবে। এই রকেট সার্ভিসে বেশ কয়েকটি স্টিমার রয়েছে। ভাড়া সমান হলেও সব স্টিমারের মান-মর্যাদা এক সমান নয়। শূদ্র, ব্রাহ্মণের মতো যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। অস্ট্রিচ, মাসুদ, গাজী স্টিমারগুলোর কেবিন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও অন্য স্টিমারগুলো সাধারণ মানের। ঢাকা থেকে বরিশাল রুটে নদীপথে যাতায়াতে অবশ্য রকেট স্টিমারের বিকল্প আধুনিক যাত্রীবাহী লঞ্চ রয়েছে। দ্বীপরাজ, অ্যাটলাস, সাগর, পারাবত- এমন ধরনের বেশকিছু লঞ্চ কোম্পানি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন চালু করেছে, ভাড়াও তুলনামূলক অনেক কম। রকেট স্টিমারে টুইন বেড কেবিনের ভাড়া যেখানে ৯০০ টাকা, সেখানে লঞ্চে বড়জোড় ৬০০ টাকা খরচ করলে সহজেই কেবিন পাওয়া যায়। তবে রকেট স্টিমারে ভ্রমণে যে আয়েশি মেজাজ থাকে, লঞ্চের কেবিনে তার ছিটেফোটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষ ধরনের যাত্রী যাদের কাছে টাকার চেয়ে সময়ের মূল্য বেশি, তাদের জন্য রয়েছে আকাশপথে বিমান সার্ভিস। মাত্র হাজার টাকার বিনিময়ে এক ঘণ্টায় পৌঁছানো যায় বরিশালে। গাজীর প্রশস্ত ফ্রন্ট ডেকের গার্ডেন চেয়ারে বসে চা পান করতে করতে স্টিমার বুড়িগঙ্গা ব্রিজ, পাগলা ঘাট পেরিয়ে এসেছে। নদীর দুপাড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ডকইয়ার্ড, নির্মাণ কারখানা, সিমেন্ট, গরান কাঠ বিক্রয় কেন্দ্র ছাড়াও বিচিত্র ধরনের শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এর ওপর রয়েছে শত শত মালবাহী কোস্টার-বার্জ ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জলযানের ভাসমান অবস্থান। এমনিতেই নদীর প্রবাহ বলতে অনেক বছর ধরে উজানে অবরুদ্ধ, এর ওপর অবৈধ দখলদারির আগ্রাসনে বুড়িগঙ্গা যৌবন হারিয়ে সত্যিকারের এক জীর্ণশীর্ণ বুড়িতে রূপান্তর হয়েছে। বিশাল গাজী স্টিমারের সারেং অনবরত সিটি বাজিয়ে নদীর বুকে চলমান নৌকা, ট্রলার এবং জলযানকে রীতিমতো শাসিয়ে পথ পরিষ্কার জন্য হুঙ্কার দিচ্ছিল। ডেকে চেয়ারে বসে আর বেশিক্ষণ নদী পাড়ের বিচিত্র জনপদের দৃশ্য উপভোগ করা সুযোগ রইল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই আলোকোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্বের ইতস্ত বিচ্ছিন্ন ঝলক ছাড়া আর সবকিছুই ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে আলো-অন্ধকার রহস্যময়তায় ঢেকে গেল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদরঘাট থেকে রকেট স্টিমার ছাড়ার সময় সকাল সাড়ে ৮টার স্থলে ৬টায় পরিবর্তন করা এবং নদীপথের কম বিপর্যয়ের মুখে স্টিমারে চড়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামীণ দৃশ্য উপভোগ করার তেমন সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে ঢাকা থেকে বরিশাল পর্যন্ত এ আকর্ষণীয় পথটুকু রাতের অন্ধকারে আড়াল হয়ে থাকে। অথচ এককালে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, প্রলয়ংকারী মেঘনার গভীর

খাড়ি বেয়ে রকেট স্টিমার স্টিম-ইঞ্জিনের ভোঁ বাজিয়ে জমজমাট চাঁদপুর বন্দরে জাহাজ ভেড়াতো। সে সময়কার লাল ফতুয়া গায়ে বিহার উড়িষ্যার পশ্চিমা মুলুক থেকে আসা কুলিদের হাকডাকে গমগম করে উঠতো বন্দর এলাকা। অজস্র টুকরি ইলিশ, রুই, কাতল, পাঙ্গাশ, আইড়, বোয়াল, গজার, চিতল এমনি কতো বিচিত্র ধরনের মাছ জাহাজের খোল থেকে খালাস হয়ে অপেক্ষমান ট্রেনে ভরতি হয়ে চালান হয়ে যেত

দেশের আনাচে-কানাচে। ঘণ্টাখানেক বিরতির পর আবার যখন সেই স্টিমার ১৫-২০ মাইল প্রশস্ত ভয়ঙ্কর পদ্মা-মেঘনার মোহনায় উত্তাল ঢেউয়ের বুকে পাড়ি জমাতো, সেই বুক কাঁপানো অভিজ্ঞতার কথা প্রবীণরা কখনোই ভুলতে পারবে না। দিক চিহ্নহীন সেই উথাল পাতাল নদীর বুকে জলকবুতরের মতো ঢেউয়ের তালে দুলতে দেখা যেত শত শত ইলিশ মাছের নৌকা। কী প্রচণ্ড সাহসী এবং বুকের পাটা ছিল এ সমস্ত শিকারী জেলেদের। সাদা, নীল, লাল নানা রং-বেরঙের পাল তুলে আসন্ন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে উত্তাল ঢেউয়ের সমুদ্রসম পারাবার পাড়ি জমাতে তাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের লেশ দেখা যায়নি। বাংলাদেশের মতো এমন সাহসী মাঝি-মাল্লা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় কিনা আমার জানা নেই।

ইতিহাসের কালগুণে প্রমত্তা পদ্মা, উত্তাল মেঘনার বুকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ধু ধু বালুচরের অমোঘ পরিবেষ্টনীতে পড়ে সেই সব পদ্মা-মেঘনার খাড়ি নির্জীব নিস্তেজ। নদীর বুকে দেখা যায় না রঙিন পালের বহর। দেখা যায় না ঢেউয়ের নাগরদোলায় চড়ে দুর্বার মাঝি-মাল্লার বাছারি বা ডিঙি নৌকার সাহসী যাত্রা। দেখা মেলে না গভীর সাগর থেকে নদীর স্রোতে চিরায়ত উজানি পথে ছুটে আসা কোটি কোটি ইলিশ মাছের ঝাঁক। নদী প্রবাহের উজানে স্বার্থবাদী মানুষের নির্দয় হস্তক্ষেপে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, নিস্তরঙ্গ হয়েছে নদীর গতিপথ, জঞ্জাল জমেছে ভাটি স্রোতের বাঁকে বাঁকে। রুদ্ধ অভিমানে এবং চিরায়ত চেনা পথ খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেছে লক্ষ কোটি ইলিশের ঝাঁক। রুই, কাতল, বোয়াল ও পাঙ্গাশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কলুষিত অনুজালের ভেতর তাদের বংশগত অভ্যাসের ডিম ছড়িয়ে দেয়ার প্রবণতাকে।

সে সময় পদ্মা-মেঘনার এ নদীপথে ডিজেল ইঞ্জিনচালিত লঞ্চে বা অন্য কোনো জলযানের প্রচলন হয়নি। কয়লাচালিত একমাত্র প্যাডেল হুইলের এসব স্টিমার ছিল নদীপথে চলাচলের নিরাপদ বাহন। যেহেতু এই বিশাল বিস্তৃত জলপথ ছিল বিপদসংকুল, সে কারণে নারায়ণগঞ্জ বাদামতলী থেকে সব স্টিমার সকালে ছেড়ে দিনে দিনে এই পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যা বা রাতের প্রথম ভাগেই পৌঁছে যেত বরিশাল ঘাটে। গভীর রাতে বরিশাল থেকে খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া এসব স্টিমার কত নদী উপনদী পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেসব এখন ইতিকথা। প্রবীণদের স্মৃতি রোমন্থনেই হয় তো বেঁচে আছে সেসব উজ্জ্বল দিনের ছবি।

ডিনার টেবিলে ফিশ কাটলেট, মুরগির কারি আর ডাল চচ্চরি খেয়ে রেজা ভাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। মুরগির সালুনের হলুদ মরিচের ঝাল এবার আমার ওপর ঝেড়ে দিয়ে বললেন- এই নাকি আপনাদের বিখ্যাত রকেট স্টিমারের রেসিপি-পর নমুনা! আমার নিজের ধারণা ছিল না বাংলাদেশ স্বাধীনতার কয়েক বছরের ব্যবধানে ঐতিহ্যবাহী রকেট সার্ভিসের সেই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বখ্যাতি আজ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উন্নত বিশ্ব যখন সত্যিকার রকেটে চড়ে আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণের কল্পনাকে বাস্তবে প্রায় রূপান্তরিত করে এনেছে, আমরা তখন আত্মঘাতী ও ভুল রাজনীতির কুটচালে আমাদের প্রতিভাকেই শুধু বিসর্জন দিচ্ছি না বরং উদ্ভট কল্পনায় ফানুস উড়িয়ে জাতিকে প্রবঞ্চনামূলক আত্মতৃপ্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছি।

রাতের অন্ধকারের বুক চিরে গাজী স্টিমার তার পেটে টিউমার সদৃশ বিরাট আকারের স্টিম বয়লার ফেলে দিয়ে অধুনা ট্রান্সপ্লান্টেড শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনের দুই পাশের বিশাল প্যাডেল হুইলের ঘূর্ণনে নিস্তরঙ্গ। মেঘনার পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে চাঁদপুরের ম্রিয়মান বন্দরের দিকে। রাতের আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্র। আলোকোজ্জ্বল শহরের বুকে রাতের আকাশের এমন উজ্জ্বল ঝকমকে চেহারাটা ফুটে উঠে না। এ কারণে চোখের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে আকাশের বুকে ফুটে থাকা এমন অজুত লক্ষ কোটি নক্ষত্রের রহস্যময়ী ছবি। উদার প্রকৃতির এমন মায়াময় পরিবেশকে অবহেলা করে বদ্ধ কেবিনের বিছানায় নাক ডেকে ঘুমানোর মধ্যে আমি কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। রেজা ভাইয়ের মাঝেও খুঁজে পেলাম সেই একই মানসিকতা। কাজেই রকেট স্টিমারের ফ্রন্ট ডেকে চেয়ার পেতে বসে আমাদের আড্ডা জমাতে কোনো বাধা রইল না।

স্টিমারে বেড়ানোর কথা উঠলেই একটা নস্টালজিয়া আমাকে আবেগতাড়িত করে টেনে নিয়ে যায় পুরনো দিনের মণিকোঠায়। তখনো ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়নি। ইংরেজ আমলের অন্তিমপর্ব। আমি তখন ৭/৮ বছরের এক চঞ্চল বালক। এই গাজী স্টিমারে চড়ে জালালদি স্টেশন থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পৌঁছে সেখান থেকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বিখ্যাত শেখ বাড়িতে ছোট মামার বিয়েতে অংশগ্রহণ করা ছিল আমাদের গন্তব্য পথ। গাজী স্টিমার তখন কয়লার ইঞ্জিনে চলাচল করতো। কিন্তু সেবার স্টিমারের বয়লারে কি এক বিপত্তি ঘটায়, আমাদের সে বরযাত্রী না পৌঁছানোর কারণে বিবাহ বাসরে নেমে এসেছিল আনন্দের পরিবর্তে শব-যাত্রার বেদনা। যাইহোক, নির্ধারিত সময়ের একদিন পরে হলেও বিবাহ উৎসব শেষ পর্যন্ত জমেছিল এবং আমাদের জন্য কই মাছ ভাজা, মুরগির কোরমা, খাসির কাবাবসহ ২১ রকমের পিঠাপুলির জমজমাট খানাখাদ্যের আয়োজনে মুখরিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলের অন্তিমকাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ বন্দর ছিল অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণের প্রধান ঘাট। তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নদীপথই ছিল প্রধান। ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত ইস্টার্ন রেলওয়ের কিছু ভাঙাচোরা বগি ও ওয়াগন নিয়ে ভারত বিভাগের সময় গঙ্গার মা ভাগবাটোয়ারায় ভারত ব্রডগেজের ভালো বগি সব আটকে দিয়েছিল বিধায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে তা চলাচল করত। অন্য রুট ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ হয়ে জগন্নাথগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর হয়ে পদ্মার স্রোতে উজিয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত নদীপথে চলাচল ছিল খুব আয়েশি এবং মালামাল পরিবহণের জন্য খুব সহজ। এসব নদীপথে চলাচলের জন্য সে আমলে অন্ততপক্ষে ৪০/৫০টি কয়লাচালিত বড় বড় স্টিমার ৫/৬টি রুটে নিয়মিত চলাচল করতো।

এর ভেতর সবচেয়ে জনপ্রিয় রুট ছিল গোয়ালন্দ ঘাট থেকে ছেড়ে আরিচার কাছে কাঞ্চনপুর হরি-রামপুরের জালালদি ঘাট, তারপাশা, ষাটনল, চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। এ রুটটি জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ ছিল গোয়ালন্দ থেকে সরাসারি ট্রেনে কলকাতাসহ বহুদূর দূরান্তে রেলপথের যোগাযোগ থাকার কারণে।

দ্বিতীয় জনপ্রিয় রুট ছিল নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার চাঁদপুর বরিশাল হয়ে খুলনা পর্যন্ত যাতায়াত। তবে সবচেয়ে দীর্ঘতম নদীপথ ছিল নারায়ণগঞ্জ ঘাট থেকে যে স্টিমারগুলো চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, জগন্নাথগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ, তিস্তামুখ ঘাট, ফুলছুড়ি হয়ে আসামের ধুবরী পর্যন্ত চলাচল করত। ৩/৪ দিনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ যাত্রীদের জন্য একগুঁয়েমির বিরক্তি সঞ্চার করলেও কেবিনে বসে উপভোগ করার এমন সুন্দরর সুযোগ অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বিচিত্র নামে স্টিমার চলতো সাধারণ যাত্রী পরিবহণের জন্য। যেমন- আলোয়ার, গাজী, সিন্ধি, বালুচ, শেরপা, গারো, কিউই, মাসুদ, মেহমন্ড, অস্ট্রিচ, ইরানি, আফগানি, টিল ইত্যাদি। নিকটবর্তী নৌরুটে চলাচল করত আরও বেশকিছু স্টিমার। যেমন- পিরোজপুর, লাকি, মেকলা, লেপচা, বার্মা, সন্দ্বীপ, শীল, মাজিরি, রাইসা ইত্যাদি।

সদরঘাট থেকে মানিকগঞ্জ রুটে চলতো সান্দ্রা, লেপচা, শিউলি, টিল-টার্ন এমন ধরনের কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টিমার। তখনকার দিনে ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ অথবা আরিচা ঘাট পর্যন্ত কোনো হাইওয়ে ছিল না। একমাত্র জলপথ ছিল এ অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য সহজ মাধ্যম। মালামাল পরিবহণের জন্য ছিল বিশেষ ধরনের স্টিমার, যেগুলোকে বলা হতো ডেসপাস স্টিমার। বিশাল আকারের এসব ডেসপাস স্টিমার ৫০০/৬০০ টন মালামাল সযত্নে লোড করে নিয়ে বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশে সারা বছরই বিভিন্ন খরস্রোতা নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, তিস্তা, আত্রাই ইত্যাদির নদী প্রবাহ পাড়ি দিয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে উত্তরে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে চাঁদপুর-বরিশাল থেকে খুলনা হয়ে গভীর সুন্দরবনের খাড়ি বেয়ে ডায়মন্ড হারবার ও কলকাতা পর্যন্ত নদীপথে স্টিমার চলাচলের নিয়মিত চল ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এসব স্টিমার, ডেসপাস ও বিশাল আকারের ফ্লোটিং ফ্ল্যাট (যেখানে পরিবহণ করা মালামাল লোডিং ও আনলোডিং করার জন্য জমা করা হয়)। এসব জলযান কলকাতার খিদিরপুর ডকইয়ার্ড থেকে নির্মাণ করা হতো। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০৩ সালের ভেতর এই ডকইয়ার্ড থেকে যেসব জাহাজ পন্টুন ফ্ল্যাটবার্জ তৈরি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় তার অস্তিত্ব টিকে না থাকলেও বাংলাদেশে তার অনেকগুলো বহাল তবিয়তে চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বেশির ভাগ জলযান কলকাতা বন্দরে বিভিন্ন কৌশলে আগে থেকেই আটকে রাখা হয়েছিল, যাতে পাকিস্তানের ভাগে এসব জলযান না পড়ে। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও খুলনার খান এ সবুরের নেতৃত্বে বেশকিছু স্টিমার ও ফ্ল্যাট পন্টুন খুলনা বন্দরে আটকে রাখায় কিউই, গাজী, অস্ট্রিচ, মাসুদ নামে বেশ কয়েকটি প্যাডেল হুইল স্টিমার পাকিস্তানের ভাগে ধরে রাখতে সক্ষম হয়, এ কারণে আজকে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীপথে ঐতিহ্যবাহী রকেট স্টিমার সার্ভিস চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। প্যাডেল হুইল সংযুক্ত এসব স্টিমারে জ্বালানি হিসেবে সরাসরি পাথর কয়লা ব্যবহৃত হতো।

ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল এদের পাকা বাবুর্চির হাতের লাঞ্চ ও ডিনার। এছাড়া কেতাদুরস্ত বয়-বেয়ারা যেভাবে যাত্রীদের সেবা প্রদান করতো তা মনে রাখার মতো। মাত্র এক টাকা চার আনায় হাতেটানা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ মাখন, নিজেদের বেকিং করা সুস্বাদু রুটি, মামলেট, ডাবল এগ পোচ, রামপালের বিখ্যাত সাগর কলাসহ টি-কফি ছিল হেভি ব্রেকফাস্টের নির্ধারিত মেন্যু। লাঞ্চ ও ডিনার ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। ভরা এক বাটি মাখনসহ বাটার টোস্ট, ফিশ ফ্রাই উইথ পটেটো চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, স্মোকড হিলশা, চিকেন রোস্ট, মাটন স্টু এপ্রিকট সহকারে বিগ বাউলসে কাস্টার্ড পুডিংসহ ফিনিশিং টাচ দেয়া হতো টি-কফি দিয়ে। যার মূল্য ধরা হতো মাত্র ৪ টাকা

বিশাল আকারের বয়লার জাহাজের খোলে স্থাপন করে দগদগে কয়লার আগুনে পানি গরম করে স্টিম জমা করা হতো এবং সেই স্টিমের শক্তিতে ইস্পাত নির্মিত বিভিন্ন কলকব্জা ও বিশাল আকারের ইঞ্জিনকে চালু রাখা সম্ভব হতো। সে সময় নদীপথের সব জলযান কয়লার ইঞ্জিনে চলাচল করতো, এমনকি স্থলপথে রেলও চলতো কয়লার ইঞ্জিনে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে সম্পর্কহীন তৎকালীন বাঙালি সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে কায়িক শ্রমনির্ভর ও পশ্চাৎপদ। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের বাহন বলতে ছিল পালকি, ঘোড়া বা গরুর গাড়ি। জলপথে গুনটানা, পালতোলা অথবা দাড়টানা কাঠের নৌকা। যেমন- বজরা, পানসি, বাছারি বা গয়নার নৌকা। নদী-খালের বিস্তৃতি ও গভীরতার সঙ্গে ও মালামাল পরিবহণের জন্য ছিল ভিন্ন ধরনের কোষা, ছান্দি বিচিত্র নামে নৌকা। এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার নব আবিষ্কৃত তৎকালীন ব্রিটিশ রাজকর্তৃক প্রবর্তিত বাষ্পচালিত স্টিমার ও ট্রেন; স্থানীয় ভাষায় রেলগাড়িতে চড়ে বেড়ানোর সুযোগ তৎকালীন বাঙালি সমাজে যে কোনো স্তরের লোকের জন্যই ছিল চরম বিস্ময়ের, আনন্দের এক আকর্ষণীয় ভ্রমণ বিলাস।

তখনকার দিনে এসব প্যাসেঞ্জার স্টিমারে উচ্চ শেণির যাত্রীদের জন্য ছিল অত্যন্ত আয়েশি ও আভিজাত্যপূর্ণ প্রথম শ্রেণির কেবিন। দীর্ঘ যাত্রাপথে সদলবলে আড্ডা এবং ডিনার, লাঞ্চ ও ব্রেকফাস্ট করার জন্য ছিল অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন সাজানো সেলুন। ফ্রন্ট ডেকে পাতা থাকতো পাহ-াড়ি বেতের তৈরি গার্ডেন চেয়ার, যেখানে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের ছিল এক রাজকীয় আয়োজন। প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণের সুযোগ ব্রিটিশ আমলে কোনো বাঙালি ভ্রমণকারীর জন্য অত্যন্ত সীমিত ছিল। কেননা, বাঙালি বলতেই তারা ছিল নেটিভ। নেটিভদের জন্য প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সরকারি উঁচু পদে চাকরি অথবা অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণি হিসেবে ব্রিটিশদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে এমন কতিপয় লোকের জন্য প্রথম শ্রেণিতে যাতায়াতের সুযোগ মিলতো। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট ভালো সুযোগ ও কেবিনের ব্যবস্থা থাকলেও মধ্যম শ্রেণির যাত্রীদের জন্য থাকতো বারোয়ারি কেবিন অর্থাৎ একই কেবিনে একাধিক পরিবার অথবা দলের নিরাপদ অবস্থানের সুযোগ। অন্য সব সাধারণ যাত্রীদের জন্য ছিল উন্মুক্ত ডেক, যেখানে কে কার আগে এসে জায়গা দখল নিতে পারে। এমন প্রতিযোগিতামূলক চর দখলের সুযোগ সাধারণ যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলে প্রতিটি স্টেশনে স্টিমার ভেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই নেটিভ যাত্রীদের ভেতর যে হুলুস্থুল শুরু হতো, ব্রিটিশ প্রভুরা সেসব দৃশ্য দেখে খুব তৃপ্তি নিয়ে উপভোগ করতেন বলে মনে হয়। ডেকের খোলা চত্বরে একবার দখলে নিতে পারলে যার যার বিছানাপত্র, লোটা-কম্বল, বাক্স-পেটরা ইত্যাদি পাহাড় সাজিয়ে দখল করা এলাকা সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে নিতে ভুল হতো না অভিজ্ঞ যাত্রীদের। তবে ভোগান্তি হতো নবাগত অথবা অত্যন্ত নিরীহ মেজাজের যাত্রীদের জন্য। অবশ্য জাহাজ চলা শুরু হলে অথবা কিছুক্ষণ অবস্থানের পর পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও বেশি সময় নিত না।

স্টিমারের দ্বিতল ডেকে মাঝ বরাবর থাকতো বারোয়ারি টি-স্টল। জিবে পানি আসা হরেক রকমের মিষ্টি, রসগোল্লা, চমচম, কালোজাম, পানতোয়া, লেডিক্যানি ছাড়াও থাকতো গলাটেপা কাঁচের বোতলে লেমনেড পানীয়, পান, বিড়ি, সিগারেটসহ নানা পণ্য। মুখের সামনে ঝুলানো থাকতো পাকা সবরি অথবা রামপালের সাগর কলার ছড়া। নিচে বাটলারের কিচেন রুম থেকে ভেসে আসতো নদী থেকে সংগৃহীত তাজা ইলিশ ও রুই মাছ রান্নার সুবাস। চিকেন, মাটন অথবা ফিশ ফ্রাইয়ের অভিজাত শ্রেণির রেসিপির সুবাসে সাধারণ যাত্রীদের অর্ধ ভেজানোর তৃপ্তি পাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো প্রত্যাশাও ছিল না, সুযোগও ছিল না।

পাকিস্তান আমলেও রকেট স্টিমারে প্রথম শ্রেণির চাকচিক্য, আভিজাত্যের জৌলুস ব্রিটিশ আমলের মতো অতটা ধারালো না হলেও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাবেক আমলের ধারাবাহিকতা বহাল রাখা হয়েছিল। রকেট স্টিমারের এই শানশওকত বিদেশি রাষ্ট্রীয় মেহমানদেরকে প্রদর্শন করার জন্য পাকিস্তানে সফর করতে এলে ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত সরাসরি রকেট স্টিমারে এসে খুলনার বিখ্যাত জুটমিল, নিউজপ্রিন্ট মিল এবং শিপইয়ার্ড পরিদর্শনের পর সুন্দরবনের মৃগয়া ভ্রমণ ছিল অবধারিত। বিশেষ করে পাকিস্তানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানের রকেট স্টিমারে বসে বাটলারের জাদুর হাতের ডিনার না খেতে পারলে তার পূর্ব পাকিস্তান সফর পানসে হয়ে যেত। সে আমলে গাজী, কিউই, অস্ট্রিচ এমন সব স্টিমারে যেসব বাটলার চাকরিতে নিয়োজিত ছিল তাদের অনেকের গলায় এখনো হয় তো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের দেয়া স্বর্ণপদক শোভা পাচ্ছে। তবে রকেট স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণের বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়ে যে কোনো নাগরিকের সার্বজনীন অধিকার পাকিস্তান আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রকেট স্টিমারে ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল এদের পাকা বাবুর্চির হাতের লাঞ্চ ও ডিনার। এছাড়া কেতাদুরস্ত বয়-বেয়ারা যেভাবে যাত্রীদের সেবা প্রদান করতো তা মনে রাখার মতো। মাত্র এক টাকা চার আনায়

হাতেটানা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ মাখন, নিজেদের বেকিং করা সুস্বাদু রুটি, মামলেট, ডাবল এগ পোচ, রামপালের বিখ্যাত সাগর কলাসহ টি-কফি ছিল হেভি ব্রেকফাস্টের নির্ধারিত মেন্যু। লাঞ্চ ও ডিনার ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। ভরা এক বাটি মাখনসহ বাটার টোস্ট, ফিশ ফ্রাই উইথ পটেটো চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, স্মোকড হিলশা, চিকেন রোস্ট, মাটন স্টু এপ্রিকট সহকারে বিগ বাউলসে কাস্টার্ড পুডিংসহ ফিনিশিং টাচ দেয়া হতো টি-কফি দিয়ে। যার মূল্য ধরা হতো মাত্র ৪ টাকা। আর ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ভাড়া ছিল ৭০/৭৫ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া ছিল ৪০ টাকা আর ইন্টার ক্লাসের ভাড়া ছিল ১৪ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণির ডেকের যাত্রীর ভাড়া ছিল ৮ টাকা। তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আলাদা খাবার রেস্টুরেন্টে বসে মাত্র ১০ আনায় পদ্মার তাজা ইলিশ ভাজা, মাংসের কারি ও ডাল ফ্রি পেটচুক্তি খাবারের স্বাদ ছিল অতুলনীয়। এমন সস্তার বাজারেও অফিসিয়াল ট্যুর ছাড়া খুব কম সংখ্যক বাঙালি দেখা যেত, যারা গাঁটের পয়সা খরচ করে রকেট স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করতে সাহসী হতো।

স্টিমারের ওপেন ফ্রন্টডেক চেয়ারে বসে রেজা ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো দিনের এসব আলাপচারিতায় কখন যে ঘড়িতে রাত ১টা বাজার নির্দেশক ঘর পার হয়ে গেছে টেরই পাইনি। দূর থেকে চাঁদপুর বন্দরের ঝলমল বৈদ্যুতিক বাতির আলোর ঝলকানি আমাদেরকে জানান দিচ্ছে ঘাট বেশি দূরে নয়। মাস্টার ব্রিজ থেকে সারেং সাহেব সিটি বাজিয়ে স্টিমারের আগমন বার্তা ঘোষণা করে দিচ্ছেন।

সৌখিন ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে এখনো রকেট স্টিমার অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রথম পছন্দের নৌভ্রমণ। বর্তমানে রকেট স্টিমার বহরে চালু রয়েছে মাসুদ, অস্ট্রিচ, লেপচা ও টার্ন। এই স্টিমারগুলো থাকলেও নিয়মিত সার্ভিসে কখন কোন স্টিমার চালু থাকবে এই নিশ্চয়তা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় এবং প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ট্যুর অপারেটর রকেট সার্ভিস সংযোগ করে কোনো ভ্রমণ প্যাকেজ তৈরি করার ঝুঁকি নেয় না।

কারণ, কেবিন রিজার্ভ পাওয়া যাবে কিনা বা রিজার্ভ করলেও ওই দিন কোনো উপরস্থ ব্যক্তি বা কর্মকর্তার ভ্রমণ সূচির কারণে কেবিন বাতিল হবে কিনা এমন অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

সৎ ও দক্ষ সারেং-সুকানি নিয়োগ দিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধীনে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ পরিচালনায় এবং বিদেশি পর্যটকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সার্ভিসকে ন্যস্ত করা হলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রিভারাইন ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হবে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আকর্ষণীয় স্থান।

ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আনন্দ আয়োজন, উৎসব ও খেলাধুলা সবকিছুতেই নদী ও নৌকার সরব আনাগোনা। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংস্করণ নৌকা বাইচ। এক সময় এ দেশে যোগাযোগ ছিল নদীকেন্দ্রিক আর বাহন ছিল নৌকা। এখানে নৌ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র। এসব শিল্পে যুগ যুগ ধরে তৈরি হয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর। এভাবে একসময় বিভিন্ন নৌযানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়

পর্যটন বিকাশের অপার সম্ভাবনা 'জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর'

ড. মো. আতাউর রহমান

বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে লোককাহিনিতে ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় অথবা বিদেশি পরিব্রাজকদের বিবরণীতে এবং সর্বোপরি প্রত্ন-নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যে বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন বাংলার জাতি গোষ্ঠী ছিল মিশ্র তথা সংকর জাতের বা প্রকৃতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক সমৃদ্ধি উভয়ই ছিল বিশ্বের সেরা। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তাই জাতীয় স্বার্থে হলেও জরুরি ভিত্তিতে এ সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তথা বিলুপ্তপ্রায় জাতিসত্তাগুলোকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

আর এই জাতিসত্তাগুলোকে যথাযথভাবে রক্ষা ও সঠিকভাবে তাদের পরিচিতি ও জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে যেমন দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি তুলে ধরা সহজ হবে, অন্যদিকে এর মাধ্যমে পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংরক্ষিত নিদর্শনাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতির আগে চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (Ethnological Museum) চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। এটি দেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর। মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অনুভূতি লালনের জন্য এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের উপজাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস সমন্বিত উপকরণের প্রদর্শন করা হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের দুইটি জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের মধ্য চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর অন্যতম, অন্যটি রয়েছে জাপানে। এটি গবেষণাকাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ২০২২ সালের হিসাবে, জাদুঘর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন দেশি-বিদেশি গবেষকসহ ৩০০-৫০০ জন দর্শনার্থী এই জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার বাদামতলী মোড়সংলগ্ন ১.২৫ একর জায়গার ওপর ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ শতকের ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে জাদুঘরটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ জানুয়ারি সর্বসাধারণের জন্য জাদুঘরটি উন্মুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে জাদুঘরে আরও দুইটি কক্ষ অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী জাদুঘরটির উদ্বোধন করেন।

একতলা বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী জাদুঘরটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এখানে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় হলঘরসহ পাঁচটি গ্যালারি এবং ১১টি বড় পরিসরের কক্ষ। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি গ্যালারিতে তিনটি করে কক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও শুধুমাত্র পশ্চিমের দুইটি গ্যালারিতে দুইটি করে কক্ষ নির্মিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে জাদুঘরে মোট প্রদর্শনী কক্ষের সংখ্যা ১১টি।

গ্যালারি-১

এই গ্যালারিতে প্রবেশের পূর্বে জাদুঘরের প্রবেশকক্ষ বা স্বাগতকক্ষ রয়েছে। এটির বামপাশের হ্যাংগিং ওয়ালে রয়েছে মানবজাতির মূল চারটি ধারার প্রোট্রেট (নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলয়েড, ককেশাস ও অস্ট্রোলয়েড)। সেই সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবেশকক্ষের ঠিক ডানদিকে হ্যাংগিং ওয়ালে রয়েছে পৃথিবীর তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাসের অবস্থান সম্বলিত মানচিত্র। এটি প্লাস্টার অব প্যারিসে তৈরি করা।

প্রবেশকক্ষের দুইটি নিদর্শনই দুর্লভ প্রকৃতির। এই গ্যালারির মূল রুমের প্রথমেই রয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসিম উদ্দিন, নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একেএম ফজলুল হক, ভাসানী প্রমুখের ছবিসহ বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রের রেপ্লিকা। দ্বিতীয় কক্ষে রয়েছে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনের রেপ্লিকা।

উল্লেখ্য, এই ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরটি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আমলে নির্মিত হওয়ায় পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিদর্শন সম্বলিত রেপ্লিকা এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশ সরকারের উদার নৈতিকতার কারণে তা আন্তর্জাতিক গ্যালারি হিসেবে ওই নিদর্শনগুলো এখনও প্রদর্শিত হয়ে আসছে।

এই আন্তর্জাতিক গ্যালারিতে পাকিস্তান আমলে সংরক্ষিত নিদর্শনাদি ছাড়াও ভারত, রাশিয়া ও জার্মানির প্রাচীরের অনেকগুলো নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি-২

প্রকৃতপক্ষে এই গ্যালারির প্রথম কক্ষ থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনের রেপ্লিকা প্রদর্শিত হচ্ছে। এই কক্ষে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত নিদর্শন সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের রেপ্লিকা প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, কোচ, হদি, দালুই, মান্দাই; উত্তরাঞ্চলের রাজশাহীর সাঁওতাল, মুন্ডা, রাজবংশী; দিনাজপুরের সাঁওতাল, পুলিয়া, ওঁরাও, রাজবংশী ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্যালারির দ্বিতীয় কক্ষে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মনিপুরী সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ করে সিলেটের মনিপুরী নৃত্য পরিবেশনের পোশাকের ধরন ও মৌলভীবাজারের মুসলিম মনিপুরী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাসের ছবিগুলো দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্মিত করে।

এক কথায় এই কক্ষে রয়েছে সিলেটের মনিপুরী, খাসিয়া, বোনা, পাত্র ও পাঙ্গণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি।

গ্যালারি-৩

এখানে বান্দরবান অঞ্চলের মুরুং, চাক, বম, খ্যাং ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গ্যালারির দ্বিতীয় কক্ষে রয়েছে বান্দরবান অঞ্চলের ত্রিপুরা, খুমি, বম, চাক; রাঙামাটি অঞ্চলের পাঙ্খোয়া, তংচঙ্গা, খ্যাং; নেত্রকোনা অঞ্চলের হাজং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি। এ সব জাতির ঐতিহ্যবাহী পোশাক, মৎস্য ও পশুপাখি শিকারের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, জুম চাষের ওপর ডিওরোমা, পার্বত্য দুর্গমগিরি পথে চলাচলের একমাত্র বাহন হিসেবে একখণ্ড জোড়বিহীন কাঠের তৈরি নৌকা ইত্যাদি নিদর্শন এই গ্যালারির ৭ ও ৮ নাম্বার কক্ষে রয়েছে।

গ্যালারি-৪

এখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাতিতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা ও মারমা জাতির গৌরবময় জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত নিদর্শন। এর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত পিতলের তৈরি অনেক ছোট-বড় মহামতি গৌতম বুদ্ধের মূর্তির রেপ্লিকা, চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, শিকার ধরার বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া চাষের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আদি যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ধরনের শিকারি প্রাণীর মমি। এই গ্যালারির ৮নং কক্ষে রয়েছে বান্দরবান অঞ্চলের চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ব্যতিক্রমী এক কাঠের তৈরি বিস্ময়কর নৌকা। প্রথম কক্ষে বান্দরবান অঞ্চলের মারমা, লুসাই এবং কক্সবাজারের মহেশখালীর রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কক্ষে রাঙামাটির তংচঙ্গা, বান্দরবান অঞ্চলের মারমা; তৃতীয় কক্ষে রাঙামাটির চাকমা, বান্দরবান অঞ্চলের মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শনের রেপ্লিকা ও ছবি প্রদর্শন করা হয়।

কেন্দ্রীয় গ্যালারি

১১ কক্ষের ঐতিহাসিক এই জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের মাঝখানে একটি বিশাল আকৃতির বর্গাকার হলঘর রয়েছে। এটির ছাদের উচ্চতা ২৫ ফুট। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অলংকার।

এক কথায় এই কক্ষে রয়েছে সিলেটের মনিপুরী, খাসিয়া, বোনা, পাত্র ও পাঙ্গণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন ও বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অলংকার।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এতগুলো জাতির গৌরবময় ইতিহাস ও তাদের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তারপরও এই প্রবন্ধে বাংলাদেশ, এশিয়া তথা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশ ছাড়াও আরও পাঁচ থেকে ছয়টি দেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে জাতিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কাজে নৃতাত্ত্বিক বা নৃবিজ্ঞানীদের সুবিধা হয়।

এই জাদুঘরটিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংগৃহীত সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা গেলে একদিকে যেমন সংস্কৃতিবান্ধব সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক: উপ-পরিচালক কাম কিপার, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

দ্য ল্যান্ড অব কুইন

এলিজা বিনতে এলাহী

'দ্য ল্যান্ড অব কুইন'- নামটি শুনলেই মনে হয় বিদেশ-বিভূঁইয়ের আলাপ করছি। একদম তা নয়। বলছি- আমাদের নাটোর জেলার কথা। এটি নাটোরের জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের স্লোগান। ট্যাগ লাইনটি দারুন না! আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে। বাংলায় লেখা হয় 'রাজসিক নাটোর', এটিও সুন্দর। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত থেকে জানা যায়, গঙ্গা ও করোতোয়া নদীর মাঝে অবস্থিত এলাকায়ই বরেন্দ্রভূমি। এই বরেন্দ্রভূমির উজ্জ্বল স্থান বর্তমান নাটোর জেলা। আর এই রাজসিক নাটোরের এক উজ্জ্বল রত্ন রানি ভবানী। গোটা বাংলাদেশে নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজবংশের কথা যত সমাদৃত, রানি ভবানী কিংবা নাটোর রাজবংশের কথা ঠিক তত সমাদৃত নয়। কারণ, দিঘাপাতিয়া রাজবাড়িকে উত্তরা গণভবন হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে হয় তো এর জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটোর, নাটোর রাজবংশ কিংবা রানি ভবানী- এই তিনটি শব্দ প্রায় সমার্থক। তাই নাটোরের কথা বলতে হলে রানি ভবানীর কথা এমনিতেই চলে আসে।

অর্ধ বঙ্গেশ্বরী...! হ্যাঁ, রানি ভবানীকে এই নামেই ডাকা হতো আঠারশ' শতকে। প্রায় অর্ধেক বাংলা যিনি শাসন করেছেন দারুন দক্ষতার সঙ্গে। রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা, জনহিতকর কাজ, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা, প্রজাবাৎসল্যতার জন্য আজও তিনি অন্নপূর্ণা, অহল্যা, প্রজাদরদিনী ও দ্বীনপালিনী নামে পরিচিত। নাটোর রাজবংশের এক উজ্জ্বল তারা রানি ভবানী। নাটোরের রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রানি ভবানী রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পান ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। রানি ভবানীর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের খুব অল্পই টিকে রয়েছে। বিশাল জমিদারির রাজধানী নাটোরে স্থাপনকে কেন্দ্র করে বিচিত্র জনশ্রুতি রয়েছে। সম্ভবত ১৭০৬ থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে নাটোর রাজবাড়ি নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি নাটোর তখন রাজশাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজকাল রাজশাহী বলতে যত ছোটখাট জেলা বোঝায়, সেকালে সেরকমটি ছিল না। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জমিদারি বিস্তৃত ছিল রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, বীরভূম ও বর্ধমান পর্যন্ত।

মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাসাদের মতোই নাটোর রাজবাড়িতে প্রবেশের জন্য রয়েছে দীর্ঘ পথ, যার দুপাশে অত্যন্ত যত্নে গড়ে তোলা বোতল পাম গাছের সারি। নাটোর রাজপরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন নাটোরেই স্থাপন করেছিলেন তার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সেই সঙ্গে নির্মাণ করেছিলেন রাজপ্রাসাদ, দীঘি, মন্দির, ফল ও ফুলের বাগান। ইতোপূর্বে নাটোর ছিল লস্করপুর পরগনার অন্তর্গত কানাইখালি তরফের একটি ছোট বসতি। প্রায় ৪০ একর জমির উপর নির্মিত বর্তমান প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি দুটি প্রতিরক্ষা পরিখা দিয়ে বেষ্টিত। পরিখাটি ছই ভাঙার বিল নামে পরিচিত ছিল। ভগ্ন প্রাসাদের বিচ্ছিন্ন সাতটি ব্লককে বেষ্টনকারী কাদা ও আগাছা আচ্ছাদিত দীঘি সেই পরিখার চিহ্ন বহন করছে।

আগেই বলেছি, নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ রামজীবন। মহারানি ভবানী তারই পুত্রবধূ। রানি ভবানীর দত্তকপুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় পরে জমিদারি লাভ করেন। রাজা রামকৃষ্ণের সময় বিশাল নাটোর রাজ্য পরিণত হয় ক্ষুদ্র জমিদারিতে। রাজা রামকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। এই সময় থেকেই জমিদারি দুই তরফে ভাগ হয়। বড় তরফের জমিদার বিশ্বনাথ রায় ও ছোট তরফের জমিদার শিবনাথ।

আপনি এখন নাটোর ভ্রমণে গেলে দুই তরফের মূল প্রাসাদ, কাছারি, গেস্টরুম, রঙমহল, গার্ডদের ভবন, মালামাল রাখার ঘর এবং নানা ধরনের মন্দির দেখতে পাবেন। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। পুরো রাজ্য তখন ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। টিকে থাকা ক্ষুদ্র রাজ্য দেখতে আমার দেড় দিন লেগেছে। এমনটি নয় যে, আমি প্রথম বার সেখানে গিয়েছি। ২০১৮ সালে যা দেখেছি এখন দেখতে গিয়ে নতুন লাগছিল আর অনেক অদেখা বিষয় চোখে পড়েছে। তবে খুব যত্নে নেই রানি ভবানীর সাম্রাজ্য।

লেখক: শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া।

এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার

খুলছে পর্যটনের দুয়ার

পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সর্বোবৃহৎ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার (এটিএফ) শুরু হলো। কোভিড পরবর্তী এ মেলার আয়োজন পর্যটনের দুয়ার খুলবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। রাজধানী ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেশন সিটি, বসুন্ধরায় তিন দিনব্যাপী এ মেলা ২৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে। চলবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মেলা খোলা থাকবে।

এর আগে মেলা উপলক্ষে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এমপি।

প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যটন শিল্প পুনরুদ্ধারে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের আয়োজন অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহিত করবে। এছাড়া দেশি-বিদেশি পর্যটন সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে পর্যটন শিল্পের দারুণ প্রচার-প্রচারণার সুযোগ বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য পর্যটন এখন একটি অন্যতম শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে নানা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং নানা ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্দেশনা দিচ্ছেন। বর্তমান সরকার পর্যটনবান্ধব। আশা করা যায়, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামী কয়েক বছরেই এ দেশের পর্যটন শিল্প কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

মাহবুব আলী এমপি এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচারের এ সুযোগকে কাজে লাগানোর নির্দেশনা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দিন হেলাল।

তিনি বলেন, বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় পর্যটন বিচিত্রার আয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায়,

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় এ মেলা হচ্ছে। কোভিড পরবর্তী এ মেলা আয়োজনের ফলে পর্যটনের দুয়ার খুলবে।

৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারে আটটি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভারত, ভুটান, মালেয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও লিথুনিয়াসহ প্রায় ১৩০টি দেশের বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা মেলায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৫০টির বেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মেলায় রয়েছে পর্যটন মৌসুমে দেশ-বিদেশে বেড়ানোর বিভিন্ন আকর্ষণীয় ভ্রমণ অফার, হোটেল, রিসোর্ট বা প্যাকেজ বুকিংসহ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, ক্রুজলাইন্স, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর ও থিমপার্কসহ বিনোদনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া মেলায় বৈচিত্র্যময় আয়োজনের মধ্যে রয়েছে পর্যটনবিষয়ক সেমিনার, শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও বিজনেস টু বিজনেস মিটিং। মেলায় থাকবে শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ মেলার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

মেলায় এয়ারলাইন্স পার্টনার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, অ্যাডভেঞ্চার ডাইনিং পার্টনার ফ্লাই ডাইনিং, ক্রুজ পার্টনার ঢাকা ডিনার ক্রুজ, এন্টারটেইনমেন্ট পার্টনার ফ্যান্টাসি কিংডম ও ট্রান্সপোর্ট পার্টনার কনভয় সার্ভিস।

এবারের মেলায় প্রাইম পার্টনার কান্ট্রি নেপাল, পার্টনার কান্ট্রি থাইল্যান্ড, ফিচার কান্ট্রি ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও লিথুনিয়া এবং মেলার হোস্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ।

মেলার প্রবেশ ফি ৩০ টাকা, প্রবেশ কুপনের বিপরীতে র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের জন্য থাকবে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ বেড়ানোর আকর্ষণীয় গিফট ভাউচার। এছাড়া প্রতিটি টিকিটেই থাকবে মেলার এন্টারটেইনমেন্ট পার্টনার ফ্যান্টাসি কিংডমে প্রবেশে ৫০ শতাংশ ছাড়।

> কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যটন শিল্প পুনরুদ্ধারে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের আয়োজন অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহিত করবে। এছাড়া দেশি-বিদেশি পর্যটন সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে পর্যটন শিল্পের দারুণ প্রচার-প্রচারণার সুযোগ বাড়বে

> এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক ও অন্যতম পর্যটন মেলা। এ মেলার মাধ্যমে পর্যটন সংস্থাগুলোও প্রচার-প্রচারণার এক বিশেষ সুযোগ পাবে। এ মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে এবং পর্যটন মৌসমে পর্যটকেদের বেড়ানোর খোঁজখবর পেতে এ মেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

> কোভিড পরবর্তী এ মেলা আয়োজনের ফলে পর্যটনের দুয়ার খুলবে

সংবাদ সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন বলেন, এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক ও অন্যতম পর্যটন মেলা। এ মেলার মাধ্যমে পর্যটন সংস্থাগুলোও প্রচার-প্রচারণার এক বিশেষ সুযোগ পাবে। এ মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে এবং পর্যটন মৌসমে পর্যটকেদের বেড়ানোর খোঁজখবর পেতে এ মেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি আরও বলেন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সরকারের পর্যটন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সব নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের পর্যটন শিল্প কোভিড পরবর্তীতে আরও জোরালোভাবে ঘুরে দাঁড়াবে এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আলি কদর, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মো. জাবের, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতিকুর রহমান, ঢাকায় নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মি. কুমার রায়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ট্রিয়াব) সভাপতি খবিরউদ্দিন আহম্মেদ, ট্যুরিজম ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হাবিব আলী ও বিডি ইনবাউন্ডের প্রেসিডেন্ট রেজাউল ইকরামসহ পর্যটন শিল্পের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্মৃতিচারণ

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্তিম সান্নিধ্য ও কিছু স্মৃতি

চিরায়ত বাংলার রূপ ও সৌন্দর্যের এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২ সালে পর্যটন করপোরেশন গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন প্রসার, বিকাশ ও বিপণন। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটনের অবকাঠামো সৃষ্টি। মোফাজ্জল হোসেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন পর্যটন বিভাগে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নেন। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে রয়েছে তার নিবিড় সম্পর্ক ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা।

মোফাজ্জল হোসেন পর্যটন শিল্পের একজন নিবেদিত কর্মী, গবেষক, ভ্রমণ লেখক এবং পর্যটন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তার লেখা ইতিহাস ঐতিহ্যবিষয়ক ভ্রমণ কাহিনি 'ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া' শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ লেখক হিসেবে পর্যটন বিচিত্রা পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে তার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'কিংবদন্তী কথা কয়' সব মহলে সমাদৃত। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষক মোফাজ্জল হোসেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ১৯৭৫ সালের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তাই টুরিস্ট কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্তিম সান্নিধ্যের স্মৃতি নিয়ে লিখিত কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি, কিছু উপলব্ধি **পর্যটন বিচিত্রায়** প্রকাশ করা হলো।

মোফাজ্জল হোসেন

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করার জন্য আসেন এবং কাপ্তাই পর্যটন মোটেলে রাতযাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র এলাকায় শত শত তোরণ নির্মিত হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোশেনের তৎকালীন চেয়ারম্যান রফিকুল্লাহ চৌধুরীসহ উচ্চ পদস্থ সবাই ছুটে এলেন কাপ্তাই। আমি তখন কাপ্তাই প্রকল্পের প্রকল্প প্রধান। পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পাকিস্তান পর্যটন বিভাগ কাপ্তাই ও কক্সবাজারকে পর্যটন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে যাত্রা শুরু করে। তখন কাপ্তাই জলবিদ্যুতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে কাপ্তাই পর্যটন কেন্দ্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই ছাড়া অন্য কোনো পর্যটন কেন্দ্র ছিল না। রাঙামাটি-বান্দরবানে তখনো কোনো পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তান পর্যটন বিভাগের সব সম্পদ ও জনবল পর্যটন করপোরেশনের ওপর ন্যস্ত হয়। সে সময় পর্যটন করপোরেশনের সর্ববৃহৎ প্রকল্প ছিল কাপ্তাই টুরিস্ট কমপ্লেক্স। ইতোপূর্বে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরিকে এখানেই সংবর্ধনা দেয়া হয়।

যাইহোক, বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া উদ্বোধন করে কাপ্তাই মোটেলের হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। হেলিপ্যাডে সবাই বঙ্গবন্ধুকে সারিবদ্ধভাবে সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুত। হেলিকপ্টার থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমি এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চস্বরে ডেকে বললেন- 'রফিক তুই কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান রফিকুল্লাহ চৌধুরী কাছে এলে তিনি আমাকে দেখিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন- 'তোকে তো ভালো লোক দিয়েছি, কিছু উন্নতি করেছিস পর্যটনের?'

আমার স্মৃতিপটে ভেসে এলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত ছাত্রজীবনের শুরুর কথা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি তখন ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। সেই ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু ময়মনসিংহ বিপিন পার্কে বক্তৃতা করেন। সে সভায় বক্তৃতা করেন রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, মামুনুল হক প্রমুখ। পরবর্তীকালে তারা দুজনই যথাক্রমে ময়মনসিংহের নান্দাইল ও ফুলপুর আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। সেদিন থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক।

১৯৫২ সালে ময়মনসিংহে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠে। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন- আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার), অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন) প্রমুখ। ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হন সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, কাজী আবদুল বারীসহ অনেকে। আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। কাজী আবদুল বারী কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাজী আবদুল আওয়ালের পুত্র, আমার সহপাঠী। তিনি বামধারার রাজনীতি করতেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় সামরিক আদালতে দণ্ডিত হয়ে বেত্রাঘাতে তার শ্রবণশক্তি লোপ পায়; যার কথা বঙ্গবন্ধু অনেক সভা-সমাবেশে উল্লেখ করেছেন। তারপর ঢাকা কলেজ ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার অনেক বার আদর্শিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। পর পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, আমি বিস্মিত হলাম বঙ্গবন্ধুর স্মরণশক্তি দেখে।

বঙ্গবন্ধুর জন্য চট্টগ্রাম শহর থেকে কই, শিং ও মাগুর মাছ আনা হয়। এসব পছন্দ করেন বলে খাবার টেবিলের নির্ধারিত স্থানে বঙ্গবন্ধুর জন্য রান্না করা বড় কই মাছ তুলে দিলে তিনি বলে উঠলেন- 'সব আমাকে দিয়ে দিবি, তোদের জন্য কিছু রাখবি না!' হেসে হেসে তিনি এ কথা বললেও তার কথায় ছিল আন্তরিকতার সুর। খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষে হলো, বঙ্গবন্ধু বিশ্রামে গেলেন। আমি মোটেলের বিভিন্ন স্থানে, কক্ষে অতিথিদের তদারক করছিলাম। দেখলাম মোটেলের একটি কক্ষে অবস্থান করছেন ও জেগে বসে আছেন আমার ছাত্রজীবনের অনুজ কবি, সাহিত্যিক মাহবুব তালুকদার, যিনি বঙ্গবন্ধুর এপিএস (পরবর্তীতে সচিব হয়েছিলেন)। আপনি একাকী কেন? মাহবুব তালুকদার সেদিন দুঃখ করে বলেছিলেন- 'জানেন না মোফাজ্জল ভাই, বঙ্গবন্ধু আজ চাটুকার বেষ্টিত, তার আদর্শের সৈনিকরা আজ তার থেকে অনেক দূরে।' আজ দীর্ঘদিন পর মনে পড়ছে মাহবুব তালুকদার সত্য কথাই বলেছিলেন। আজো সে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বঙ্গবন্ধুকে সেদিন বিদায় দিয়েছিলাম কাপ্তাই পর্যটন কমপ্লেক্স থেকে। জানতাম না বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেটাই হবে আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করা এক বাঙালি (অব.) সরকারি কর্মকর্তা, নিভৃচারী এক লেখক ও গবেষক; যার খোঁজ কেউ রাখে না।

এ ঘটনার কয়েক দিন পরই বিভীষিকাময় ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটল। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য শহীদ হলেন। এমনকি শিশু রাসেল, অন্তঃসত্ত্বা নারীও বাদ যায়নি বর্বরদের হাত থেকে। বেতারে বার বার ঘোষিত হতে থাকে লোমহর্ষক ঘটনার কথা। স্তম্ভিত, হতবাক বাঙালি জাতি। আর এদিকে কাপ্তাই শহরে মাইকে ঘোষিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে। মাইকে ঘোষিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে রাখার। অথচ এই সংগঠনটি কয়েক দিন আগেও বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনায় তোরণ নির্মাণের জন্য পর্যটন কমপ্লেক্সের ঠিক সামনে অনুমিত চেয়েছিল। আমি ও আমার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লাম। অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে রাখার সময় আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল পানি। আমি আমার সহকর্মী শওকত হাসান (যিনি পরবর্তীকালে হোটেল সোনারগাঁওয়ের স্বত্বাধিকারী ও হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সচিব হয়েছিলেন) ও সামসুদ্দিন আহমেদকে (সাবেক পর্যটন করপোরেশনের ডেপুটি ম্যানেজার) বললাম- ছবিটি আবার উঠাতে হবে, সেদিন বেশি দূরে নয়- অযথা সরকারি অর্থ খরচ থেকে বাঁচবে। আমার এ কথা শুনে তারা কী ভেবেছিলেন আমি জানি না। তবে আমি জানতাম- মেঘ সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করতে পারে। সত্য তেমনি সূর্যের মতো উদ্ভাসিত হয়।

১৫ আগস্ট এলেই বার বার মনে পড়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর কথা। পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার করুণ মৃত্যুর সঙ্গে অদ্ভুত মিল রয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার। বিশ্বাসঘাতক বিদেশি চক্রের এ দেশি এজেন্টরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। আজ বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে আছেন টুঙ্গিপাড়ায়। টুঙ্গিপাড়ার গাছ-গাছালির ছায়ায় তার সমাধি সৌধ। প্রতি নিশিতে নির্মল নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু শিশির, যেন সারা রাত হাজারো তারার চোখের জলে স্নাত হয় সমাধি। বঙ্গবন্ধু মানুষকে বিশ্বাস করতেন। কোনো বাঙালি তাকে হত্যা করতে পারে- তা তিনি ভাবতেও পারেননি। তাই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহল থেকে জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি, তিনি ছিলেন উদাসীন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন- 'It is too bad to be too good'. বঙ্গবন্ধুর বেলায়ও তাই সত্য।

লেখক: সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

DHAKA DINNER CRUISE ®

ঢাকা ডিনার ক্রুজ

/dhakadinnercruise

নৌবিহার বুকিং চলছে

শীতলক্ষ্যা, পদ্মা, মেঘনা, কাপ্তাইলেক ও টাঙ্গুয়ার হাওর

আমাদের সেবাসমূহ

- নিয়মিত ডিনার ক্রুজ
- নিয়মিত ডে ক্রুজ
- বার-বি-কিউ ডিনার
- ফেয়ার ওয়েল ডিনার
- অফিসিয়াল কনফারেন্স
- জন্মদিন ও বিবাহ উৎসব
- অন্যান্য সেবাসমূহ।

যাত্রা শুরু

পূর্বাচল রাজউক অফিস

(কাঞ্চন ব্রীজ সংলগ্ন)

(৩০০ ফিট রাস্তা ধরে মাত্র ২০ মিনিটের যাত্রা)

- **ভ্রমণ মূল্যঃ ২৫০০++**
  (ডিনার ক্রুজ / ডে ক্রুজ)
- **ভ্রমণ মূল্যঃ ৩৫০০++**
  (দিনব্যাপী)

শর্ত প্রযোজ্য**

ঢাকা ক্রুজ এন্ড লজিস্টিকস

কর্পোরেট অফিস

বাড়ি-৯৭/১, ২য় তলা, শুক্রাবাদ
ঢাকা-১২০৭

dhakadinnercruise@gmail.com
info@dhakadinnercruise.com

www.dhakadinnercruise.com

বুকিংঃ ০১৭৩০৪৫০০৯৯, ০১৮১৯২২৪৫৯৩, ০১৭০৮৪২৭৭৯৭

রানী এলিজাবেথের বুড়িগঙ্গায় নৌবিহার

পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

৭০ বছর ধরে যুক্তরাজ্য শাসন করে আসা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৮ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। বাকিংহাম প্যালেসের ভেতরে রানির মৃত্যু সংক্রান্ত সাংকেতিক ভাষা ছিল 'লন্ডন ব্রিজের পতন হয়েছে' (London Bridge is down)। ব্রিটেনের এই রানি সিংহাসন আরোহণের পর থেকে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বের নানা দেশে তার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তবে বাংলাদেশের প্রতি রানির ভালোবাসা ছিল আজীবন।

রানি এলিজাবেথ দুই বার ঢাকা সফর করেছেন। সেই সফরে এ দেশের মানুষের প্রতি প্রকাশ করেছেন গভীর ভালোবাসা। তাই রানিকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষেরও স্মৃতি অম্লান।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রথমবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা সফরে আসেন ১৯৬১ সালে। ওই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকীয় ওই সফরে তার স্বামী প্রিন্স ফিলিপও তার সঙ্গে আসেন। তারা থেকেছিলেন রমনা পার্কের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধায়। এখন সেই ভবনটি ফরেন সার্ভিস একাডেমি হিসেবে পরিচিত।

রানি এলিজাবেথ সেসময় বুড়িগঙ্গা নদীতে স্টিমারে চড়ে নৌবিহার করেন। বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ে হাজার হাজার মানুষ হাত নেড়ে রানিকে স্বাগত জানান। রানি বাংলার মানুষের এই অভ্যর্থনায় সিক্ত হয়েছিলেন। নিজেও বার বার হাত নেড়ে হাসিমুখে মানুষের ভালোবাসার জবাব দিয়েছিলেন। রানির নৌবিহারের সময় বুড়িগঙ্গায় যাত্রী পারাপারের নৌকাগুলো বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছিল।

স্টিমার থেকে ঘাটে নামার পর ৩৬ বছর বয়সি রানিকে কিশোরীরা অভ্যর্থনা জানায়। তিনি সেবার আদমজী জুট মিলও পরিদর্শন করেন। কীভাবে জুট মিলে চট উৎপাদন হয়, সেটা দেখার আগ্রহ ছিল তার। এরপর ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে সফরে এসেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। সেসময় তিনি বাংলাদেশের একটি গ্রামের নারীদের দেখতে গিয়েছিলেন। চারদিনের সরকারি সফরের একদিনে তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বৈরাগীরচালা গ্রাম দেখতে গিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে ট্রেনে করে শ্রীপুর, সেখান থেকে গাড়িতে করে বৈরাগীরচালায় যান রানি। সেখানে তিনি গ্রামের সংস্কৃতি দেখেন। কীভাবে মুড়ি ভাজা হয়, ধান থেকে ঢেঁকি দিয়ে চিড়া ও চাল তৈরি হয়, এসব তিনি দেখেন। পুকুরে মাছ অবমুক্ত ও মাছ ধরা দেখেন। পুকুর ঘুরে দেখেন, পুকুরের পাশে কুঁড়েঘরে বসেন। পুকুরের পাড়ে কুটির শিল্প, তাঁতশিল্প, পোল্ট্রির ফার্ম ঘুরে দেখেন।

রানির এই সফর এখনো গ্রামটির মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। রানির আগমন উপলক্ষ্যে ওই গ্রামে ব্যাপক উন্নয়নকাজ হয়েছিল, যা পরবর্তী সময় এলাকায় কলকারখানা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়া ঢাকায় সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যালয় ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলেন রানি এলিজাবেথ। রানির সম্মানে ১০ টাকা মূল্যের একটি স্মারক স্ট্যাম্পও (ডাক টিকিট) প্রকাশ করেছিল বাংলাদেশ সরকার।

রানির মৃত্যুতে বিশ্বের মতো বাংলাদেশও শোক প্রকাশ করেছে। তার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার।

এক নজরে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের পুরো নাম এলিজাবেথ আলেকজান্ড্রা ম্যারি। ১৯২৬ সালের ২১ এপ্রিল লন্ডনের ১৭ ব্রুটন সেন্টে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।
- রাজা জর্জ এবং রানি এলিজাবেথের প্রথম সন্তান ছিলেন তিনি।
- বাড়িতে পারিবারিকভাবে শিক্ষিত হওয়া রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ স্থলসেনাবাহিনীর নারী বিভাগ অগজিলিয়ারি টেরটোরিয়াল সার্ভিসে কর্মরত থেকে জনসাধারণের দায়িত্ব পালন করেন।
- চাচা এডওয়ার্ড অষ্টম ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন তিনি এবং তার বাবা রাজা ষষ্ঠ জর্জ হন। তার বয়স তখন ১০ বছর।
- ১৯৪৭ সালে তিনি গ্রিক ও ডেনমার্কের প্রাক্তন রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরা ফিলিপকে বিয়ে করেন।
- বাবার মৃত্যুর পর ১৯৫২ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন তিনি।
- এলিজাবেথ-ফিলিপ দম্পতির চার সন্তান রয়েছে। তারা হলেন- ওয়েলসের যুবরাজ চার্লস (জন্ম ১৯৪৮), রাজকুমারী অ্যান (১৯৫০), ইয়র্কের ডিউক যুবরাজ অ্যান্ড্রু (১৯৬০) এবং ওয়েসেক্সের আর্ল যুবরাজ এডওয়ার্ড (১৯৬৪)। ফিলিপ ২০২১ সালের এপ্রিলে ৯৯ বছর বয়সে মারা যান।
- ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাবা রাজা জর্জ মারা গেলে এলিজাবেথ কমনওয়েলথের প্রধান হন এবং সাতটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের রেজিমেন্টের প্রধান হন।
- তিনি ১৯৫৩ সালের ২ জুন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজকীয় মুকুট পরেন।
- রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, জ্যামাইকা, অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা, বাহামা, বেলিজ, গ্রেনাডা, পাপুয়া নিউ গিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্টসহ ১৫টি রাজ্যের রানি হিসেবে ছিলেন।
তার শাসনামলে ১৪ জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেসিডেন্ট ছিলেন।

বর্ণিল আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

'পর্যটনের নতুন ভাবনা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বর্ণিল আয়োজনে পালিত হয়েছে বিশ্ব পর্যটন দিবস।

২৭ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থা দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৭টায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সামনের সড়কে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া খাদ্য উৎসব, লাইভ কুকিং শো এবং হোটেল-মোটেলের আবাসনে ৩০ শতাংশ ছাড়সহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

সকাল ৮টায় বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনডব্লিউটিও) উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর দিবসটি পালন করা হয়।

‘বেস্ট ডমেস্টিক এয়ারলাইন’ অ্যাওয়ার্ড পেল ইউএস-বাংলা

পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা ‘বেস্ট ডমেস্টিক এয়ারলাইন অব দ্য ইয়ার-২০২২’ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ইন-ফ্লাইট সার্ভিস, অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী সংখ্যা, অন-টাইম ডিপারচার, ফ্লাইট সংখ্যা ও দেশের আকাশ পথে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশের আকাশ পরিবহণ খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এ পুরস্কার দিয়েছে ট্রাভেলবিষয়ক পাক্ষিক ‘দি বাংলাদেশ মনিটর’।

২৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এমপি।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন প্রতিমন্তীর কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মনিটরের সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ট্রিপলাভারের হেড অব অপারেশন্স নিশা তাসনিম প্রমুখ।

এছাড়া বেস্ট রিজিওনাল এয়ারলাইন ও বেস্ট অনটাইম ফ্লাইট ডিপারচার ক্যাটাগরিতে সিলভার এবং বেস্ট ইকোনমিক ক্লাসের ফুড ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এই বিমান সংস্থাটি।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমাদের এয়ারলাইন্সের প্রতি সব ধরনের স্বীকৃতিই যাত্রীদের আস্থার প্রতিদান।

উল্লেখ্য, সালে ইউএস-বাংলা এর আগে ২০১৬ বাংলাদেশ মনিটর কর্তৃক ‘বেস্ট ডমেস্টিক এয়ারলাইন’, প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন (পিএটিএ), বাংলাদেশ চ্যাপ্টার ‘এয়ারলাইন অব দ্যা ইয়ার ২০১৬- এ ভূষিত হয়েছিল।

কাছের দেশে বেড়ানো

কলকাতা

বাংলাদেশি ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে কলকাতা যেন বাড়ির পাশের আরশি নগর। শুধু প্রতিবেশী রাজ্য বললে ভুল হবে, পশ্চিমবঙ্গেও কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি নানা বিষয়। কালের বিবর্তনে নতুনভাবে যোগ হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়ালেখা, চিকিৎসা, পর্যটন ছাড়াও আকাশ সংস্কৃতির স্যাটেলাইট চ্যানেল তো পুরো ভারতের দখলে। কলকাতা আজ যেন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নিজের নগরীতে পরিণত হয়েছে। কূটনৈতিকভাবে ছোটোখাটো কিছু সমস্যা থাকলেও দুই বাংলার সাধারণ মানুষ একে অপরকে আপন করে নিয়েছে।

যেভাবে যাবেন

সড়ক পথে ঢাকা-কলকাতা সরাসরি বাস যাচ্ছে যশোরের বেনাপোল বন্দর হয়ে। বাস ছাড়ে কমলাপুর থেকে। আবার ঢাকা থেকে বাসে বেনাপোল পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বনগাঁ থেকে বাস, জিপ অথবা ট্রেনে করে ৮০ কিলোমিটার পথ কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারেন। খরচ কিছুটা কম, তবে পরিশ্রম বেশি। ঢাকা থেকে নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করে- বিমান বাংলাদেশ, ইউএস বাংলা, এয়ার ইন্ডিয়া, নভোএয়ার, স্পাইসজেট, ইন্ডিগো ও ভিস্তারা এয়ারলাইন্স।

যেখানে থাকবেন

কলকাতায় যাওয়ার পর থাকার জায়গার অভাব নেই। প্রচুর হোটেল, মোটেল গেস্টহাউস রয়েছে কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায়। বিদেশিদের তথা বহিরাগতদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য এখানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মানের হোটেল ও রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে। শেয়ালদা স্টেশনের পাশে রয়েছে হোটেল আশোক, টাওয়ার লজ, প্যারাডাইজ লজ ইত্যাদি। আবার হাওড়া হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল, তাজ হোটেল, পিয়ারলেস ইন, পার্ক হোটেল, হোটেল গুলশান ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি। তবে এগুলো তারকা মানের এবং ব্যয়বহুল। নিউ মার্কেটের আশপাশে রয়েছে হোটেল ভিআইপি ইন্টারন্যাশনাল, ভিআইপি কন্টিনেন্টাল, হোটেল সম্রাট, প্রেসিডেন্সি হোটেল ইত্যাদি।

যা যা দেখবেন

ঘুরে দেখার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে কলকাতায়। ভালোভাবে দেখতে হলে সময় লাগবে। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের তথ্য ও বিবরণ দেয়া হলো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে এটি নির্মিত হয়েছিল। মূল্যবান মর্মর পাথর ব্যবহার করে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়। মহারানির ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত অমূল্য সামগ্রী যেখানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়।

বিড়লা প্লানেটরিয়াম

বিড়লা প্লানেটরিয়াম বা বিড়লা তারকামণ্ডল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পূর্বদিকে সেন্ট পালন গির্জার পাশেই অবস্থিত। এখানে সৌরজগৎ সম্পর্কিত অজস্র তথ্য প্রদর্শনী জানা যায়।

চিড়িয়াখানা

বেলভেয়ার রোডের ধারে আপিরের চিড়িয়াখানা ভারত বিখ্যাত। চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে মাছের অ্যাকুরিয়ামটি চিড়িয়াখানার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষণ- সাদা বাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গণ্ডার, বেবুন, জলহস্তী, শিম্পাঞ্জি, শ্বেত ভালুক, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ছাড়াও এখানে রয়েছে- দুর্লভ প্রজাতির হাঁস ও সাপ। বাঘ ও সিংহের যৌথ প্রজননের টাইগন আপনাকে মুগ্ধ করবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চিড়িয়াখানা খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি।

সায়েন্সসিটি

সায়েন্সসিটি কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, কাগিরগরি ও প্রযুক্তির আধুনিকতম সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান সিটি। কলকাতার ধর্মতলা থেকে বাসে সায়েন্সসিটি যাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর সেতু

বিদ্যাসাগর সেতু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিস্ময়কর অবদান। রবীন্দ্র সেতুর চাপ লাঘব করার উদ্দেশ্যে এর দক্ষিণে হুগলি নদীর উপরই অত্যাশ্চর্য এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের ১০ অক্টোবর সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। এটি এশিয়ার দীর্ঘতম তারের রশিতে ঝুলন্ত সেতু।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

ইংরেজ আমলে কর্নেল কিও বোটানিক্যাল গার্ডেনের পত্তন করেন। প্রথম দিকে এটা ছিল মূলত উচ্চপদস্থ ইংরেজি কর্মচারীদের বিনোদন কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রজাতির বহু গাছ রয়েছে এখানে। প্রায় ৯০০ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠেছে এই বাগান। শহিদ মিনারের কাছ থেকে বাসে করে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া যায়।

জাদুঘর

ভারতের সবচেয়ে বড় এই জাদুঘর চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। মিসরের সাড়ে ৪ হাজার বছর আগের মমিও রয়েছে এই জাদুঘরে। ধর্মতলা থেকে পার্ক স্ট্রিগামী বাসে করে জাদুঘরে আসা যায়।

মার্বেল প্যালেস

১৮৫৫ সালে এই মার্বেল প্যালেসটি নির্মাণ করা হয়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সংগৃহীত বহু শিল্প বস্তুর সম্ভার রাখা হয়েছে এই প্যালেসে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও রাম মন্দিরের কাছে মুক্তরাম বাবু স্ট্রিটে অবস্থিত এই প্যালেস। রাজেরন মালিকের বাগানবাড়ি নামেও পরিচিত এটি। এছাড়া মেট্রো রেলওয়ে অর্থাৎ পাতাল রেল, ময়দান, বেলুর মাঠ, রবীন্দ্র সরোবর, রেসকোর্স, শহিদ মিনার, হাওড়া ব্রিজ, ইডেন গার্ডেন, গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানগুলো পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে এবং ভ্রমণ স্মৃতিকোঠায় সারা জীবন মনে থাকবে।

কেনাকাটা ও খাবারদাবার

কলকাতা নিউ মার্কেট ও এর আশপাশে রয়েছে অনেক দোকানপাট। এছাড়া চাঁদনী চক, বড়বাজার, খিদিরপুর, ফ্যান্সি বাজার থেকেও কেনাকাটা করা যায়। আর খাবারদাবারের হোটেল রয়েছে এসব মার্কেট ঘিরেই।

দার্জিলিং

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অনন্য সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র দার্জিলিং। এটি বাংলাদেশিদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম।
বাংলাদেশের অতি নিকটে স্বল্প ব্যয়ে ভ্রমণের এক আদর্শ স্থান হচ্ছে দার্জিলিং। মনে হয়, বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে প্রথম পছন্দের নাম দার্জিলিং। ৮,৫৯৮ মিটার (২৯,২০৯ ফুট) উচ্চতার পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের বহু বর্ণিল আলোকচ্ছটার অপার্থিব রূপ দেখতে তাই মানুষের এত আকর্ষন। এই জেলা ইকো ট্যুরিজমের অন্যতম পীঠস্থান।

শিলিগুড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়ং, জলঢাকা, গৌরবাথান, জোড়বাংলো, মিরিক, নালবাড়ি, প্রধাননগর, দুখিয়াপোখরি এই জেলার বিখ্যাত জায়গা।

দার্জিলিং বেড়াবেন বিভিন্ন পয়েন্টে

গময় ও রুট বিবেচনা করে দার্জিলিং শহর ও এর আশপাশের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলো ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন পয়েন্টে। যেমন- টু পয়েন্ট বলতে গঙ্গামায়া পার্ক ও রক গার্ডেন ভ্রমণ। থ্রি পয়েন্ট ভাগ করা আছে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখার জন্য টাইগার হিল, বিখ্যাত ঘুম বৌদ্ধমন্দির ও বাটাশিয়া লুপ।
ফাইভ পয়েন্টের অন্তর্ভুক্ত স্পটগুলো হচ্ছে- জাপানি মন্দির, লালকুঠি (কাউন্সিল ভবন), আভা আর্ট গ্যালারি এবং ধীরধাম মন্দির ইত্যাদি। সেভেন পয়েন্ট বলে পরিচিত স্থানগুলো হচ্ছে- পদ্মজা নাইডু জ্যুওলজিক্যাল পার্ক, বিখ্যাত হিমালয়ান মাউন্টেরিয়ান ইনস্টিটিউট, রোপওয়ে, পর্বতারোহণ স্বাদ পেতে, বিশাল এক পাথরে উঠানামা জন্য তেনজিং রক, চা বাগান, তিবক্ষতী রিফুজি ক্যাম্প এবং হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, চারদিকে সুউচ্চ উপতক্যার মাঝে সমতল মাঠ, দার্জিলিং গুর্খা স্টেডিয়াম ইত্যাদি।

ম্যাল এলাকা

দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে জমজমাট ও নানা পর্যটকদের মিলনমেলা বসে ম্যাল এলাকায়। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের মাঝে একটুখানি সমতল এলাকা। আয়োজনও চমৎকার। সমগ্র ম্যাল এলাকা রেলিং দিয়ে বেষ্টন করা আছে। ছোট ছোট বেঞ্চি রয়েছে বিশ্রাম ও আড্ডা দেয়ার জন্য। ম্যাল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, বিভিন্ন দ্রব্যের দোকান, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক আরও কত কী। স্টুডিও তো আছেই, সেই সঙ্গে পাবেন ক্যামেরা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো পেশাদার ফটোগ্রাফার। ইচ্ছে করলে আপনার পছন্দের আলোকচিত্রটি পেশাদার আলোকচিত্রীকে দিয়ে তুলে নিতে পারেন।

নাইটিঙ্গেল পার্ক

ম্যাল চত্বর ছাড়িয়ে আরও কিছু দূর উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন নাইটিঙ্গেল পার্কে। দার্জিলিং ভ্রমণ বিনোদনে খুব বেশি হয়নি এই পার্কটি সংযোজনের। হাজারো পাখির কলকাকলি, উঁচু স্থান থেকে সশব্দে গড়িয়ে পড়া ঝরনার পানির বর্ণিল আলোকচ্ছটা এবং পুরো পার্কটিকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। পাখির কলকাকলি শুনে ভাবছেন পাখি কোথায়? একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন পাখির এ কিচিরমিচির শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিমভাবে। নাইটিঙ্গেল পার্কের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে স্থানীয় গুর্খা জাতিসত্তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে নাচ ও গানের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব হচ্ছে উপস্থিত অতিথিদের অংশগ্রহণে নাচ ও গান। সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য এক সন্ধ্যা কাটিয়ে আসতে পারেন নাইটিঙ্গেল পার্কে। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জ্যুওলজিক্যাল পার্ক ম্যাল চৌরাস্তা থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে জহর পর্বতের গায়ে এই পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে। হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের বেশকিছু নমুনা রয়েছে এই জ্যুলজিক্যাল পার্কে। এর মধ্যে জানা-অজানা বিচিত্র ও দুর্লভ গাছ-গাছালি ছাড়াও আপনি দেখতে পাবেন মিসুলয়ের অতিকায় কালো ভল্লুক, সাইবেরিয়ান বাঘ, তিব্বতের হিংস্রতম নেকড়ে, গণ্ডার, সাম্বার ও চিত্রা হরিণ, ইলামা হায়না, লাল পাণ্ডা এবং নানা রঙ ও আকৃতির বহু প্রজাতির পাখি।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট

পদ্মজা নাইডু জ্যুওলজিক্যাল পার্ক ও হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট একই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। পর্বতারোণের প্রশিক্ষণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির বেশ খ্যাতি রয়েছে। এখানকার মিউজিয়ামে আপনি পৃথিবীর প্রথম দুই পর্বতারোহী তেনজিং ও হেলারি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ঘটনাবহুল ও বিখ্যাত সব পর্বতারোহী ও আরোহণের তথ্যবহুল প্রদর্শনী যেমন দেখবেন, তেমনি আপনি দেখতে পাবেন পর্বতারোণের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রদর্শনী।

হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেন

উঁচু পাহাড়ের অপরূপ উপত্যকায় গড়ে তোলা হয়েছে চা বাগান। এই বাগানে এসে গাছ থেকে চা পাতা তোলা থেকে শুরু করে চা তৈরির যাবতীয় কলাকৌশল দেখে নিতে পারেন।

টাইগার হিল

শেষরাত থেকে অসংখ্য জিপের সারি ও মানুষের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে ওঠে টাইগার হিল। দার্জিলিং শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টাইগার হিল কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখার ভিউপয়েন্ট হিসেবে খ্যাত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫৫৫ মিটার উঁচুতে টাইগার হিলের ভিউপয়েন্ট থেকে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র বরফের রাজ্যে সূর্যের প্রতিফলনে বহু বর্ণিল আলোর ঝলকানি দেখার জন্য টাইগার হিলে আপনাকে আসতেই হবে। পরিষ্কার আকাশ থাকলে টাইগার হিল থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টও দেখা যায়। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাবেন কিন্তু ট্রয় ট্রেনে চড়বেন না তা কী হয়? বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত ন্যারো গেজ লাইন দিয়ে যখন ট্রেনটি চলতে থাকে এর মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে! ট্রয় ট্রেন জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাতায়াত করলেও দীর্ঘ পথের সময় বাঁচাতে আপনি দার্জিলিং থেকে 'ঘুম' স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করে বিশ্ব ঐতিহ্য এই ট্রয় ট্রেনের কিছুটা রোমাঞ্চের স্বাদ পেতে পারেন।

রক গার্ডেন

দার্জিলিং থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রক গার্ডেনে কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হচ্ছে প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে কৃত্রিমভাবে তৈরি সিঁড়ি। বেশ সাজানো-গোছানো আয়োজন দেখতে পাবেন রক গার্ডেনে এসে। পিকনিক স্পট হিসেবে এটি বিখ্যাত।

গঙ্গামায়া পার্ক

রক গার্ডেন থেকে আরও ৩ কিলোমিটার দূরে বিশাল এক জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে বেশ বড় এলাকাজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে গঙ্গামায়া পার্ক। পার্কের ভেতর লেকে নৌকা ভ্রমণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে আদিবাসীদের পরিবেশিত নাচ ও গানের ব্যবস্থা। স্থানীয়দের তৈরি হস্তশিল্প দোকান, খাবার ব্যবস্থা সবই আছে এখানে।

দার্জিলিং যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে দার্জিলিং যাওয়া এখন অনেক সহজ হয়েছে। বাসে লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী সীমান্ত দিয়ে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে জিপে দার্জিলিং। দার্জিলিয়ং থেকে প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে জিপ ব্যবহার করতে হবে। দার্জিলিংয়ে বিভিন্ন মানের হোটেল রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হোটেল হচ্ছে- তারকামানের হোটেল দি নিউ এলগিন হোটেল, মে ফেয়ার হিল রিসোর্ট, হোটেল মোহিত, হোটেল সিনকেয়ার্স ইত্যাদি। এছাড়া হোটেল উমা, হোটেল স্বাতী, হোটেল ব্রডওয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন মানের হোটেল গোটা শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়

পূর্ণিমার রূপ যেমন অপার্থিব আনন্দ দেয়, তেমনি আঁধারেরও তো রূপ আছে! পরিষ্কার মেঘহীন আকাশে দার্জিলিং যেমন তার রূপের ঐশ্বর্য মেলে ধরে তেমনি বর্ষায় সবুজ পাহাড় ও বিশাল ঝরনাধারার অন্য রূপ দেখতে পাবেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে শীতের তীব্রতার পাশাপাশি হয় তো তুষারপাতেরও দেখা পেতে পারেন। সমতলের মানুষের জন্য তুষারপাত দেখা দারুন আনন্দের ব্যাপার বৈকি! দার্জিলিং ভ্রমণের সবচেয়ে আদর্শ সময় হচ্ছে মার্চ থেকে মে মাস এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস।

মেঘালয়

একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা

ভারতের আসামের দক্ষিণ অবস্থিত মেঘালয় রাজ্যটি জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় নিয়ে গঠিত। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘালয় রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে। 'মেঘালয়' নামটি নাকি স্বনামন্য ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নির্বাচিত হয়েছিল। মেঘালয়ের তিনটি জাতিগোষ্ঠী হলো- খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো। শিলং হলো খাসিদের অতি প্রিয় শহর। ধর্ম খ্রিস্টান হলেও উপজাতীয় সংস্কার এবং মূল্যবোধের প্রতি এরা শ্রদ্ধাশীল। খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের ছেলেরা মায়ের পদবি ব্যবহার করে, পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার বর্তায় কনিষ্ঠা কন্যার ওপর, মেঘালয়ের উপজাতীয় মানুষ বিশেষ করে খাসিরা অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল ও সংগীতপ্রিয়। মেঘালয়ের পর্যটন পরিকাঠামো প্রধানত খাসি পাহাড়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জোয়াই অঞ্চলে পর্যটকদের উপস্থিতি কিছুটা বাড়লেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা গারো পাহাড় আজও সাধারণ পর্যটকদের ভ্রমণসূচির বাইরে রয়ে গেছে

শিলং

মনে রাখবেন শিলং শহরে রাত আটটা মানেই বেশ রাত। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, পথে লোক চলাচল বেশ কমে যায়। ট্যাক্সির দেখা মেলাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হোটেলের বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে ডিনার সারলে সময় থাকতেই নিজেদের হোটেলে ফিরে যাবেন। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং খাসি পাহাড়ের প্রধান শহর। গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে শিলংয়ের দূরত্ব ১০১ কিলোমিটার। পল্টনবাজার থেকে ভোর না হতেই শেয়ারের সুমোজাতীয় গাড়ি শিলংয়ের উদ্দেশে ছুটতে আরম্ভ করে। এছাড়া রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বাস সার্ভিস। গুয়াহাটি থেকে শিলং যাওয়ার পথে পড়ে জোড়বাত মোড়, বার্নিহাট, উমলিং নংপো আর উমসিং নামে ছোটবড় জনপদ। এর পরই পথের ডানদিকে চোখে পড়বে অপরূপ উমিয়াম লেক, যা বড়াপানি নামেও পরিচিত। উমিয়াম লেককে পেছনে ফেলে রেখে হালকা চড়াই পথ ধরে আরও ১৬ কিলোমিটার গেলেই শিলং। শিলংয়ের প্রাণকেন্দ্র হলো পুলিশবাজার এলাকা। প্রচুর হোটেল ছাড়াও এখানে রয়েছে মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস টার্মিনাল, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড আর মেঘালয় ট্যুরিজমের কাউন্টার।

শিলং শহরে পায়ে হেঁটে বেড়ানো এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এখানে পদে পদে বৈচিত্র্য। পুলিশবাজার-বড়বাজার এলাকায়

ঘোরাঘুরি করলে দেখা যাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানান ভাষাভাষীর মানুষ এখানে বিক্রেতা বা ক্রেতা রূপে উপস্থিত।
পথের ধারেই রকমারি পসরা সাজিয়ে বসে আছে খাসি নারী-পুরুষের দল।
শিলং বেড়ানোর বিশেষ জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে- এলিফ্যান্ট ফলস, লেডি হায়দারী পার্ক, ওয়ার্ডস লেক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিলং পিক, ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল, বিশপ-বিডন ফলস, স্টেট মিউজিয়াম।

ভ্রমণ পরিকল্পনা

একটি সাশ্রয়ী মূল্যে ভ্রমণের খরচ কেমন হবে, কীভাবে যেতে হবে, থাকবেন কোথায়, খাবেন কী, পাসপোর্ট, ভিসা, যাতায়াত ভাড়া, বর্ডার ইমিগ্রেশন ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে আগেভাগে জেনে নিতে হবে।

কীভাবে যাবেন, খরচ কেমন

ঢাকা থেকে যেকোনো এসি/নন-এসি বাসে সিলেট। বাসগুলো রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে ছেড়ে যায় এবং সকাল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে পৌঁছে।
সিলেট বাসস্ট্যান্ড থেকে জাফলংয়ের বাস পাওয়া যায়। কদমতলী থেকে জাফলংগামী বাসে উঠতে হবে। সময় লাগবে দুই ঘণ্টার মতো। এখান থেকে কেউ শিলং যেতে চাইলে স্থানীয়ভাবে শেয়ার ট্যাক্সি আছে। রিজার্ভ ট্যাক্সি নিয়েও ঘুরে বেড়ানো যাবে। লোকেশন অনুসারে সারাদিনের জন্য ভাড়া ৩,০০০-৩,৫০০ রুপি।
ট্যাক্সির ঝামেলায় না গেলে মেঘালয় ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিস্ট বাসে করেও ভ্রমণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে জনপ্রতি ৩০০ থেকে ৫০০ রুপি লাগতে পারে।

কোথায় থাকবেন

মেঘালয়ে ঘুরতে গেলে থাকলে পারেন শিলংয়ে। এখানে ১৫০০-৩০০০ টাকার মধ্যে ভালো হোটেল পাবেন।

কী খাবেন

সব জায়গায় মুরগি, ডিম, ভাত, নুডলস, পরোটা পাবেন। চলতি পথে লুচি, আলুদম চা, পানি, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি পাবেন।

পাসপোর্ট ও ভিসা

বিদেশ ভ্রমণের জন্য বৈধ পাসপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসা থাকা আবশ্যক। তাই আপনার যদি পাসপোর্ট না থাকে তাহলে পাসপোর্ট করে নিন। ভারতীয় ভিসার আবেদন করার সময় ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের পোর্ট অব এন্ট্রি-এক্সিট অবশ্যই 'BY ROAD DAWKI' সিলেক্ট করুন।
ভ্রমণ কর/ট্রাভেল ট্যাক্স
স্থলপথে ভ্রমণ করের পরিমাণ ৫০০ টাকা। যা আগেই নির্ধারিত ব্যাংক বা বর্ডারে সোনালী ব্যাংকের বুথে জমা দিতে পারবেন।

ইমিগ্রেশনে যা করতে হবে

ডাউকি বর্ডারের বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে অন্যান্য বর্ডারের তুলনায় সহজ ও ভিড় কম থাকে। প্রথমেই ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করতে লাইন ধরে পুলিশের কাছ থেকে একটা বহিরাগমন কার্ড (Departure Card) সংগ্রহ করে পূরণ করে পাসপোর্টসহ জমা দিতে হবে।
ইমিগ্রেশন শেষ করে কাস্টমস অফিসে গিয়ে এন্ট্রি করতে হবে। এখানে ভ্রমণ করের রশিদ জমা দিতে হবে। কাস্টমসের কাজ শেষ হলে বিজিবি নাম এন্ট্রি করবে তাদের নির্ধারিত খাতায়।
বাংলাদেশ অংশের কাজ শেষ হয়ে গেলে ভারতের অংশে ঢুকতেই বিএসএফ পাসপোর্ট চেক করে ভেতরে ঢুকতে দেবে। পরে ভারতীয় ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস অফিসে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। সেখানে Arrival Card পূরণ করে ইমিগ্রেশন শেষ করতে হবে।

কেনাকাটা

শিলং শহরে সুলভমূল্যে কেনাকাটার জন্য বড়বাজার ও পুলিশবাজার এলাকা সুবিধাজনক। কেনার জন্য রয়েছে কমলালেবুর মধু, বেত ও

বাঁশের তৈরি সামগ্রী, খাসি চাদর, কমলালেবুর জেলি, মাশরুম, গৃহসজ্জার উপকরণ ও শীতবস্ত্র। মেঘলায়ে যেতে চাইলে একটি ভ্রমণ পরিকল্পা থাকার দরকার।

মনে রাখবেন

উপজাতীয় মানুষদের বা তাদের বাড়িঘরের ছবি তোলার আগে অবশ্যই অনুমতি নেবেন। নারীদের ছবি তোলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

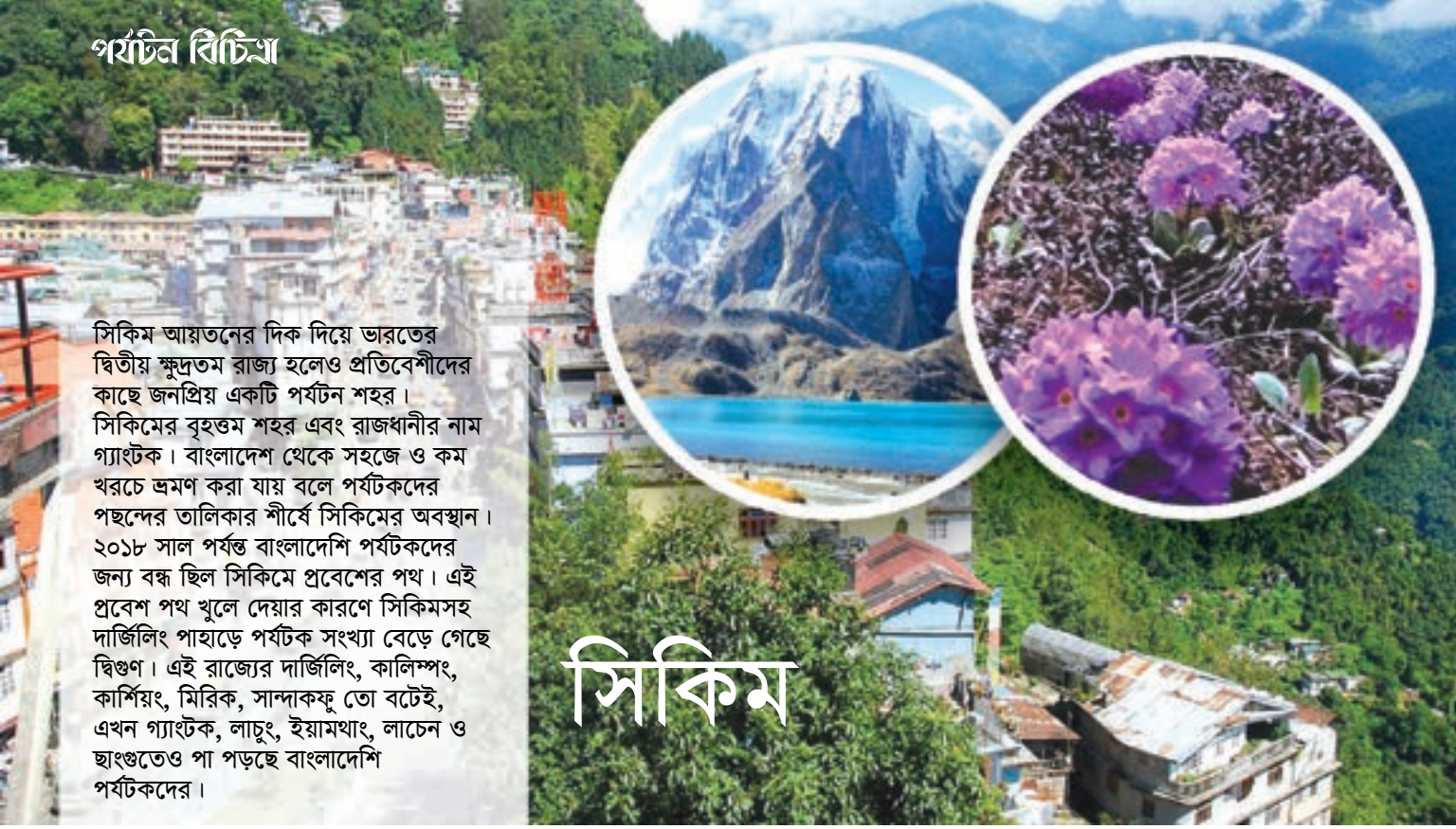

সিকিম

সিকিম আয়তনের দিক দিয়ে ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য হলেও প্রতিবেশীদের কাছে জনপ্রিয় একটি পর্যটন শহর। সিকিমের বৃহত্তম শহর এবং রাজধানীর নাম গ্যাংটক। বাংলাদেশ থেকে সহজে ও কম খরচে ভ্রমণ করা যায় বলে পর্যটকদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে সিকিমের অবস্থান। ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য বন্ধ ছিল সিকিমে প্রবেশের পথ। এই প্রবেশ পথ খুলে দেয়ার কারণে সিকিমসহ দার্জিলিং পাহাড়ে পর্যটক সংখ্যা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। এই রাজ্যের দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়ং, মিরিক, সান্দাকফু তো বটেই, এখন গ্যাংটক, লাচুং, ইয়ামথাং, লাচেন ও ছাংগুতেও পা পড়ছে বাংলাদেশি পর্যটকদের।

কী দেখবেন

ঘুরে দেখার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে সিকিমে। ভালোভাবে দেখতে হলে সময় লাগবে। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের তথ্য ও বিবরণ দেয়া হলো।

গ্যাংটক

সিকিম রাজ্যের রাজধানী শহর হলো গ্যাংটক। এটি মূলত পূর্ব সিকিমের অন্তর্গত। গোটা শহরটি যেন পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ কেন্দ্র ও সিকিমের হিমালয়ান শীর্ষ থেকে ট্র্যাকিং করার জন্য হাইকারদের বেজক্যাম্প হিসেবে পরিচিত গ্যাংটক। এখানকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের মধ্যে তাশি ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও আশপাশের পাহাড় দেখা যায়। এখানে বান ঝাকরি ফলস দেখার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞাতও হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী সম্বলিত সিকিম হিমালয়ান জ্যুওলজিক্যাল পার্ক, রুমটেক মনাস্ট্রি, এনসে মনাস্ট্রি, নাথু লা, রিডজ ফ্লাওয়ার পার্ক, সারামসা গার্ডেন, লহাসা ফলস ও গান্ধী মূর্তির মতো দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। আর গ্যাংটকের ক্যাম্পিং, রোপওয়ে, রাফটিং, ট্র্যাকিং ও হাইকিংয়ের সুযোগ তো পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।

পেলিং

পশ্চিম সিকিমের ছোট শহর পেলিং। স্কাই ওয়াক পেলিংয়ে পাহাড়ের ওপর ঝুলন্ত ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজ দিয়ে মন্দিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে কম নয়। রিম্বি নদীর পাশে রিম্বি অরেঞ্জ গার্ডেনে এলাচ, কমলা ও কাঠবাদাম দেখতে পারবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে অনেকেই এখানে আসেন।

লাচুং

গ্যাংটক থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত লাচুং গ্রামে যেতে প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। চারপাশে অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ ও ইয়ামথাং ভ্যালি যাওয়ার পথে তিস্তা নদীর স্বচ্ছ নীল পানি ও দুইটি অসাধারণ ঝরনা মনকে প্রশান্তি এনে দেবে। ইয়ামথাং ভ্যালি থেকে দূরের পাহাড়ে বরফের সন্ধান পাবেন। এখানে আপেল বাগান দিয়ে ঘেরা ১৯ শতকের বৌদ্ধ লাচুং মঠ রয়েছে। এছাড়া ভিম নালা ফলস, খান্দা ওয়াটার ফলস এবং ট্র্যাকিং করার জন্য রয়েছে স্নো পয়েন্ট।

সাঙ্গু লেক

গ্যাংটক থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব সিকিমে অবস্থিত সাঙ্গু লেক। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩,৭৫৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই বরফের হ্রদ সিকিমের অন্যতম একটি পর্যটন স্থান। বিশেষ করে সাঙ্গু লেকে যাওয়ার রাস্তা অদ্ভুত সুন্দর। এখানের আবহাওয়া খুবই ঠান্ডা। যত ওপরের দিকে যাওয়া যায়, ঠান্ডার তীব্রতা তত বাড়তে থাকে। স্নো ফলের মধ্যে বরফ দিয়ে খেলা করার মজা এখানে না আসলে কখনো বোঝা যাবে না।

ইয়ুকসোম

পশ্চিম সিকিমের একটি ঐতিহ্যবাহী শহর ইয়ুকসোম। এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝরনা, ছোট ছোট লেক ও বৌদ্ধ মন্দির আছে। হাইকিং করার সুযোগও আছে।

ইয়ামথাং

ইয়ামথাং ভ্যালি সাধারণত ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস নামেও পরিচিত। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে জুনের মধ্য সময়ে বিভিন্ন রঙের ফুলে পুরো ভ্যালি ঢেকে থাকে।

এছাড়া লাচেনের মনাস্ট্রি, রাভাংলার বৌদ্ধপার্ক, রালাং মনাস্ট্রি, সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট, নামছির হিলটপ মনাস্ট্রি, চার ধাম টেম্পল, কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক, ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক, আরিতার লেক ও ঋষি খোলা ফলস পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান।

কখন যাবেন

ফেব্রুয়ারি-মে এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর পর্যন্ত সিকিম যাওয়ার সবচেয়ে আদর্শ সময়। শীতকালে বরফে রাস্তা বন্ধ থাকার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া উত্তর সিকিমে সারা বছরই ধস নামে, আর বর্ষায় সিকিমের অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিম এবং গ্যাংটককে সারা বছরই যাওয়া যায়।

কীভাবে যাবেন

বাসে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা। সেখানে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন শেষ হলে ভারত সীমান্তে ইমিগ্রেশন শেষ করে অটোতে ফুলবাড়ি বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে শিলিগুড়ি যেতে হবে। শিলিগুড়িতে সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট অফিসে গিয়ে ভ্রমণের অনুমতি নিতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের রাজধানী শহর গ্যাংটকের দূরত্ব ১১৪ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

গ্যাংটক, পেলিং, লাচুং এবং এমজি মার্গে থাকার জন্য অসংখ্য হোটেল, মোটেল ও হোমস্টে আছে। গ্যাংটকে থাকার জন্য হোটেল প্রিয়দর্শিনী, হোটেল উইলস, সোয়াঙ্গ ও হোটেল নিউ হোটেল সিকিম অন্যতম।

কী খাবেন

সিকিমে সব জিনিসই খুব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সতেজ। গ্যাংটকের এমজি মার্কেট, লালবাজার রোডে সস্তার মধ্যে মজার স্ট্রিট ফুড খেতে পারবেন। নিমথ, মামা'স কিচেন, ক্রাম্বস এন হুইপ্স, ক্যাফে রয়্যাল, গুপ্তা রেস্টুরেন্ট, লোকাল ক্যাফে ও কাবুর মতো রেস্টুরেন্টে থুকমা, মম, গুনডরুক স্যুপ, শা ফালেয়, তিব্বতিয়ান ব্রেড ও লাচ্ছির মতো খাবারগুলো খেয়ে দেখতে পারেন।

জেনে নিন

সিকিমের অধিকাংশ মন্দির ও জাদুঘরে ছবি তোলা নিষেধ। তাই এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। গ্যাংটকে পাবলিক প্লেসে ধূমপান, আবর্জনা ও থুথু ফেলা আইনত দণ্ডীয় অপরাধ।

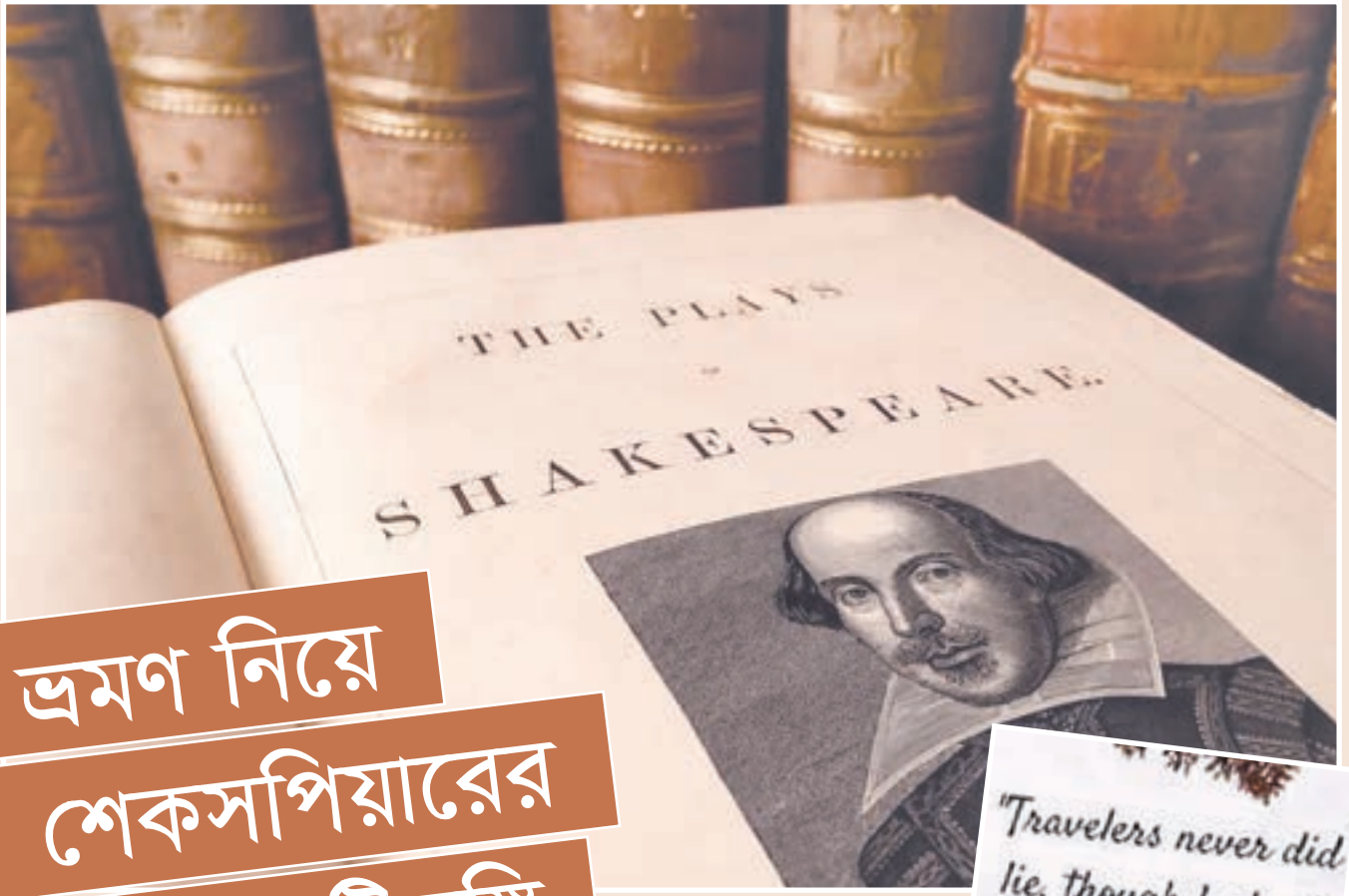

ভ্রমণ নিয়ে শেকসপিয়ারের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি

জিয়াউল হক হাওলাদার

'Travelers never did lie, though fools at home condemn them'. শেকসপিয়ারের সব নাটকে (রোমান্টিক ও ট্র্যাজিক) 'ভ্রমণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে পাওয়া যায়। ভ্রমণের প্রতি শেকসপিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনন্য। ভ্রমণ একটি Determining Factor হিসেবে তার সব নাটকে কম- বেশি দেখা যায়। ভ্রমণ হচ্ছে নাটকের মিলনাত্মক পরিণতির এপিসোড। নাটকে যখন কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব কিংবা নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অমিল/মতানৈক্য হয়েছে, সংকট দেখা দিয়েছে শেকসপিয়ার নায়ক-নায়িকা এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভ্রমণে; হয় বনে-জঙ্গলে না হয় সমুদ্রে। ভ্রমণের ফলে নায়ক-নায়িকার আত্মশুদ্ধি (purgation) ঘটেছে এবং নতুন করে স্বপ্ন দেখে এবং নাটকের মিলনাত্মক পরিণতি ঘটে। তার বিখ্যাত রোমান্টিক নাটক- As You Like it-এ জ্যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যার সঙ্গে নায়িকা রোজালিন্ডের কথোপকথনে ভ্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ নাটকে ফরেস্ট অব অডেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ডেস্টিনেশন। এ নাটকের নায়ক অর্লান্ডো বড়ভাই অলিভার কর্তৃক উত্তারাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ফরেস্ট অব অডেনে চলে আসেন। এখানেই তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই (fall in love at first sight) নায়িকা রোজালিন্ডের প্রেমে পড়ে যান। পরবর্তীতে তার বড়ভাই অলিভার নিজেই সম্পত্তি থেকে অন্যের মাধ্যমে উচ্ছেদিত হয়ে এ বনে চলে আসেন এবং সেলিয়ার প্রেমে পড়ে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুশোচনা করেন। আবার তার ট্র্যাজিক ড্রামা King Lear-এ দেখা গেছে- রাজা লিয়ার তার সব সম্পত্তি ছোট মেয়েকে না দিয়ে বড় দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন এবং বড় দুই মেয়েই তাকে ঠকিয়েছে। লিয়ার চলে গেছেন বনে। সেখানে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া ছোট মেয়েই তাকে সম্মান দিয়েছেন। বনে এসে রাজা লিয়ারের আত্মশুদ্ধি ঘটেছে।

শেকসপিয়ারের বিখ্যাত ট্র্যাজিক ড্রামা Othello-তে দেখা গেছে- নায়ক ওথেলো নায়িকা ডেসডিমোনার কাছে নিজ ভ্রমণকে গৌরবান্বিত করছেন। আবার তার নাটক The Tempest- এ সমুদ্রভ্রমণ এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সব চরিত্রদের পাঠিয়েছেন। এখানে নাটকের একটি মিলনাত্মক পরিণতি ঘটে। The Twelfth Night নাটকে ভ্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শেকসপিয়ারের সব নাটকের প্রেক্ষাপট, চরিত্র, কাল ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা জীবনের একটি দীর্ঘ জার্নি দেখতে পাই। দেখতে পাই জীবনের ভ্রমণ। শেকসপিয়ার নিজে প্রচুর ভ্রমণ করতেন; যার প্রতিফলন আমরা তার নাটকে দেখতে পাই।

উঁচুনিচু পাহাড় আর সবুজে ঘেরা ভুটানের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের

অ্যাডভেঞ্চার

বজ্র ড্রাগনের দেশে টাইগার নেস্ট অভিযান

মারজিয়া লিপি

শান্তিপ্রিয় ভুটানে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘ দিনের। ভুটানের অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে মাতৃভাষা জংখায় বলে 'দ্রুক ইয়াল' বা 'বজ্র ড্রাগনের দেশ'। সহকর্মী পিউ আপাকে বজ্র ড্রাগনের দেশের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেলেন। শুরু হলো ভুটান নিয়ে পড়াশোনা। ভ্রমণ ম্যাগাজিনে একটা লেখা পড়ে ভুটানের পুরনো রাজধানী পুনাখাতে স্বপ্নভ্রমণ শুরু করেছিলাম অনেক বছর আগেই। ২০০৩ সালে দার্জিলিং থেকে নকশালবাড়ি হয়ে জয়গাঁ নামক স্থানটিতে একরাত কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। জয়গাঁর ফটকটি পেরিয়ে সেবার ভুটানের ফুন্টসলিংয়ের কিছু দূরে গিয়েছিলাম কুমিরের ফার্মটিতে। পেশায় বন ও পরিবেশবিষয়ক কর্মকর্তা হওয়ার কারণে নিসর্গ প্রকৃতির পাশাপাশি বন আর বণ্যপ্রাণী নিয়ে আগ্রহ আমার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। সেবার ভিসার পারমিশন না থাকায় থিম্পু, পারো, পুনাখা ছিল অধরা। জয়গাঁ থেকে শুধুমাত্র ফুন্টসলিং আর জলদাপাড়া রাইনোল্যান্ড দেখেই ফিরে এসেছিলাম দেশে। কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত নিলাম একই পথে ভারতীয় ট্রানজিট ভিসা নিয়ে ভুটান ঘুরে আসবো। ভ্রমণ নিয়ে কথা হয়, কাশ্মীর ভ্রমণের সময় পরিচিত কলকাতার ট্রাভেল নেস্টের সুভাসদার সঙ্গে। দেশভাগের পূর্বে সুভাসদার পরিবারের আবাস ছিল আমাদের ময়মনসিংহে। ভুটান ভ্রমণের জন্য একজন দুইজন করে সদস্য সংখ্যা বেড়ে অবশেষে দাঁড়ালো ১৫ জনে। সহকর্মী ১১ জন আর দীপনের ৪ সদস্যের পরিবার।

ভারতীয় ট্রানজিট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও রিটার্ন টিকিটসহ ভিসা সেন্টারে আবেদনের প্রেক্ষিতে পাসপোর্ট ফেরত পেলাম কাঙ্ক্ষিত ভিসাসহ। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পরিকল্পনা মতোই ছিল, শুধুমাত্র সূর্যের ভিসা নিয়ে বিপত্তি। ফরম ফিলাপের সময় ভুলে জন্ম তারিখে একটি শূন্য কম থাকায় নির্ধারিত তারিখে ভিসা পাওয়া অনিশ্চিত। অবশেষে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে সার্ভারে তথ্য সংশোধন করা হলো। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত ভিসা হাতে আসে যাত্রার আগের দিন রাত ৮টার পর।

২০১৬ সালে ৬ অক্টোবরে ঢাকা থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয় সকাল ৮টায় নভোএয়ারে। প্রথমে সৈয়দপুর পরে মাইক্রোবাসে বাংলাবান্ধায়। ভারতীয় ট্রানজিট ভিসায় সেখান থেকে চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর হয়ে জয়গাঁয় হোটেলে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা। ভারত সীমানায় জয়গাঁ ফটকের অপর পাশেই ভুটানের ফুন্টসলিং।

ফুন্টসলিং ভুটানের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। থিম্পু ভুটানের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। ফুন্টসলিং থেকে ভুটানের রাজধানী থিম্পুর রাস্তা অসম্ভব রকমের সুন্দর। উঁচুনিচু পাহাড়, ঘন সবুজ বন, ঝরনা, কোথাও বা মেঘের লুকোচুরি। সব মিলে বেশ স্বপ্নময় যাত্রা।

ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভুটান শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'ভূ-উত্থান' থেকে, যার অর্থ 'উঁচু ভূমি'। দেশটি ভারতীয় উপমহাদেশে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাংশে অবস্থিত। তিব্বত, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ এবং আসাম দিয়ে পরিবেষ্টিত ভুটান। রাজধানী হলেও থিম্পু বেশ শান্ত স্নিগ্ধ। রাজধানীর যে কোলাহল থাকে তা একেবারেই অনুপস্থিত। আমাদের জন্য নির্ধারিত দুইটি গাড়ির একটিতে রয়েছে সুভাসদার রান্নার আয়োজন। পথ চলতে চলতে যাত্রাপথে ভারতীয় মজাদার খাবার আমাদের ভ্রমণকে করেছে নির্ভার। সেই সঙ্গে আনন্দকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ।

চারপাশের প্রকৃতির বৈচিত্র্য যেন এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ রাখতে দিচ্ছে না। সবুজ প্রকৃতি মাঝে মধ্যেই ঢেকে যায় সাদা ধোঁয়া ছড়ানো কুয়াশায়। এরকম মনোগ্রাহী দৃশ্যের দেখা পেলেই গাড়ি থেকে নেমে ফটোসেশন চলে। এর মধ্যে হঠাৎ বিপত্তি! আমাদের লাল রঙের জিপটির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পর অন্য একটি গাড়ি জয়গাঁ থেকে এসে আমাদের উদ্ধার করে। এতে নির্ধারিত সময় থেকে ঘণ্টা দুয়েক দেরি হয়ে যায়। রাজধানী থিম্পুতে পৌঁছাই রাত ৮টায়। আমাদের জন্য বুকিং দেয়া হোটেল 'তাকসান' বেশ ঝকঝকে।

ডিনার শেষে টানা আড্ডায় অনেক সময় পেরিয়ে যায়। এক সময় ঘুমের আয়োজনে ফিরে আসি যার যার রুমে। প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে আবিষ্কার করি হোটেলের পাশে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি সুন্দর নদীটিকে। রাজবল্লভী আর আলুর দমে নাশতা শেষে সবাই বের হয়ে যাই শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণের জন্য। মিউজিয়াম, বড় বৌদ্ধা আর মনাস্ট্রি ঘুরে হোটেলে ফিরে আসি দুপুরের পর। একটু দেরিই হয়ে গেল মধ্যাহ্ন ভোজের। বিকালে হোটেলের খুব কাছেই একটি শপিংমলে ছোট দলে ভাগ হয়ে কেনাকাটা করতে বের হই। মুখোশ, বৌদ্ধ মূর্তি, ভুটানের সুভ্যেনির আর দুই রকমের মরিচের সস নিয়ে ফিরে আসি সন্ধ্যার পর পরই। পরিকল্পনা ছিল পরদিন খুব সকালে নাশতা শেষে বের হয়ে যাবো পুনাখার উদ্দেশে। হোটেল চেকআউট করার সময় বুঝতে পারলাম আমাদের রুমের চাবি নিখোঁজ। সম্ভাব্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হোটেলের রিসিপশনে মাস্টার কি-ও ছিল না। ফলে সবাই দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে চাবি খুঁজতে থাকে। অভিযুক্ত সূর্য এর মধ্যেই হোটেলের পাশের সুপারশপ থেকে চাবি উদ্ধার করে ফিরে আসে হন্তদন্ত হয়ে। এ সব বিপত্তিতে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ায় আমরা যাত্রা শুরু করি বেলা ১১টায়।

শিল্পীর আঁকা পোর্টেট। প্রকৃতির এ রকম অপার সৌন্দর্যে সবাই বিমোহিত। পথে অনেক জায়গায় থেমে থেমে মন ভরে অনেক অনেক ছবি তোলা হয়। সঙ্গে ছিল আমাদের সহকর্মী নওরোজ ভাই। একটি অতিরিক্ত ব্যাগ বহন করে এনেছেন দেশ থেকে। নানা রকম আর বৈশিষ্ট্যের ক্যামেরার যন্ত্রপাতি। লেন্স পরিবর্তন করছেন ক্ষণেক্ষণে। কখনো আমাদেরকে ফ্রেমে ধরে রাখছেন ক্লোজআপ ভঙ্গিতে। কখনো বা দূরের প্রকৃতিকে তুলে রাখছেন লং-শটে। বিনা বাক্য ব্যয়ে আমাদের আবদার মেনে নিচ্ছিলেন নওরোজ ভাই হাসিমুখে। ক্যামেরায় তুলে রাখছেন আমাদের নানা রঙের রঙিন স্মৃতিময় মুহূর্তকে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সবুজ ধানের চত্বর। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসে চারপাশ। সন্ধ্যার প্রায় আগে আগে পৌঁছে যাই আমাদের জন্য নির্ধারিত হোটেলটিতে। সবাই বিস্মিত হই হোটেলের পেছনের ব্যালকনির নিচে বহমান নদী ও নদীর ওপর ব্রিজটিকে দেখে। বেশ কিছু অভিজাত রিসোর্ট রয়েছে আশপাশেই। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে চারপাশ যেন স্বপ্নময় সৌন্দর্যের মোড়কে জড়িয়ে রয়েছে। ডিনারের পর হোটেলের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা নদীর পাড়ে বালিতে বসে বিরতিহীন আড্ডা আর হেড়ে গলায় গানের শব্দে চারপাশে রাতের নীরবতা যেন ভেঙে পড়ছে। বিরতিহীন সুরে বেসুরে গানের প্রতিযোগিতা চলছে।

পরদিন ভুটান রাজার বাড়িতে বেড়াতে যাই। যদিও আমন্ত্রিত হয়ে না, টিকিট কিনে। মাচু-পিচু নদীর সংযোগস্থল। পাশেই ত্রিভুজের অনেকটা জায়গা জুড়ে অবস্থিত রাজবাড়িটি। ডিজহং ব্রিজ থেকে নদীতে রাখা রাফটিংয়ের নীল রঙের নৌকাগুলো আমাদের দৃষ্টিসীমানায়। জাদুঘর, উপাসনাঘর আর দাপ্তরিক কার্যালয় রয়েছে পুনাখা ডিজহংয়ে। হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে যাত্রা করি পারোর উদ্দেশে। একপাশে নদী আর অন্যপাশে সবুজ রঙের পাহাড়ের গা-ঘেঁষে রাস্তায় আমাদের যাত্রা। পথে সন্ধ্যায় শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পারো নদীর পাশে পৌঁছে যাই আমাদের হোটেলটিতে।

ছবির মতো সুন্দর পুনাখার সবকিছুই যেন সাজানো গোছানো। যাত্রাপথে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চমৎকার জায়গাগুলো হলো- দোচু-লা-পাস, পুনাখা ডিজহং, আর্চারি গ্রাউন্ড ইত্যাদি। এসব দেখে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি- সবাই আমরা আনন্দে ভাসছিলাম। সাদা রঙের স্মৃতিসৌধ দোচু-লা-পাসের উল্টোপাশের রেস্টুরেন্টটি ছিল একটি ভিউ পয়েন্ট। সে রেস্টুরেন্টে বসেই আমরা কফি আর হালকা নাশতা করি। কাঁচের জানালা দিয়ে দূরের সবুজ পাহাড়ের ওপর নীল আকাশ যেন কোনো আঁকা ছবির দৃশ্য।

আমাদের উদ্দেশ্য পরদিন টাইগার নেস্ট অভিযান। তাকসান মনাস্ট্রি বা টাইগার্স নেস্ট ভুটানের প্রধান ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দির। পারো ভ্যালিতে সুউচ্চ পাথুরে পাহাড়ের ঝুলন্ত খাঁজে এক অভূতপূর্ব নির্মাণশৈলীর নিদর্শন এই মনাস্ট্রি। কথিত আছে, অষ্টম খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভা (যিনি ভুটানের প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক) বাঘের পিঠে চড়ে এখানে আসেন এবং এর গুহায় তিন বছর তিন মাস তিন সপ্তাহ তিন দিন তিন ঘণ্টা তপস্যা করেন। পরে ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে তার সম্মানার্থে এটি তৈরি করেন গিয়ালসে তেনজিং রাগবে। টাইগার্স নেস্ট ট্র্যাকিং কষ্টসাধ্য, সময় লাগে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা। কিন্তু মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা। ভ্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় ফেরত আসার আগের দিন সকাল ৭টায় একটি গাড়ি নিয়ে রওনা হই গন্তব্যের উদ্দেশে। ১৭ জনের মধ্যে ৯ জন রওনা হই ট্র্যাকিংয়ের জন্য। মেয়ে ভোর ও রক্সি প্রথমবারের মতো ট্র্যাকিংয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের প্রস্তুতি ও উত্তেজনা বেশ উপভোগ করার মতো। হোটেলে রয়ে যায় দীপন ছোট্ট দ্রাবিড় আর দীপাঞ্জনকে নিয়ে এবং পিউ আপা আর দীপ্ত ভাই রায়ানকে নিয়ে। কামরুল ভাই অভিযানে সঙ্গী হলেন না। আগের রাতেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন তিনি ট্র্যাকিংয়ে আগ্রহী নন। আরও জানান, তার স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের সাবিনা ভাবির তো প্রশ্নই উঠে না এসব পাহাড়ি পথে সারাদিন হাঁটার। সকাল ১০টায় আয়েশ করে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলেন সকাল ৭টায় তার স্ত্রী ও কন্যা রওনা করেছেন ট্র্যাকিং দলের সঙ্গে টাইগার্স নেস্ট অভিযানে!

পারো শহর থেকে টাইগার নেস্টেও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড/পার্কিংয়ে যেতে সময় লাগবে প্রায় ৩০-৪৫ মিনিটের মতো। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড/পার্কিং প্লেস থেকে টাইগার নেস্টে পায়ে ট্র্যাকিং ছাড়াও ঘুরে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। বেজক্যাম্প পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। খরচ পড়বে জনপ্রতি ৬০০ রুপি/ভুটানিজ গুলট্রাম।

শুরুতে সাবিনা ভাবির পরিকল্পনা ছিল মেয়ে আদিবাকে এগিয়ে দিতে যাবেন। কিন্তু আমাদের সবার পাল্লায় পড়ে টিকিট কিনে রওনা হন। প্রথম দুই কিলোমিটার ঘোড়ায় চড়ে যান পার্কিং প্লেস থেকে টাইগার নেস্টের বেজক্যাম্প পর্যন্ত। আর বাকি পথটুকু আমাদের উৎসাহেই সামনে এগোতে থাকেন। পরিকল্পনা ছিল শুরুতে কোনো শেডে আমাদের জন্য তিনি অপেক্ষায় থাকবেন। ফিরতি পথে আমরা তাকে নিয়ে ফিরবো। একটু একটু করে আমাদের সঙ্গে তিনি পাহাড়ি পথে চলতে শুরু করেন। ৯ সদস্যের টাইগার নেস্ট অভিযাত্রীর মধ্যে আমি, সূর্য এবং সাবিনা ভাবির অবস্থান সবার পেছনে। হাঁটুতে ব্যথা থাকায় তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা এড়িয়ে চলেন।

অথচ কোনো এক অদৃশ্য টানে ১৩০০ সিঁড়ি আর আট ঘণ্টার আসা যাওয়ার পথ অতিক্রম করে ১৭০০ ফুট উচ্চতায় টাইগার্স নেস্টে পৌঁছে যান। ভাবির ভাবনার অতীত, অবিশ্বাস্য এই সাফল্যে দলের আমরা সবাই যারপরনাই আনন্দিত। সাবিনা ভাবির টাইগার্স নেস্ট বিজয় যেন আমাদের কাছে তেনজিং হিলারীর এভারেস্ট বিজয়ের মতো। তিনি বলছিলেন, কষ্ট হয়েছে আসতে, কিন্তু অনুভূতি সেই রকম, তিনি নিজেই বিস্মিত। না আসলে কখনো তিনি বুঝতে পারতেন না। বার বার বলছিলেন, 'এ অনুভূতি বোঝানো যাবে না।' তিনি মন্দিরের চাতালে বসে নফল নামাজের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করেন। মায়ের সাফল্যে আদিবাও অসম্ভব খুশি। শুধু সবার আফসোস হয়েছিল আমাদের প্রিয় কামরুল ভাইয়ের জন্য। স্ত্রী-কন্যার সাফল্যেও সাক্ষী হতে পারলেন না বলে। ঝুলন্ত তাকসান মনাস্ট্রি ও সাবিনা ভাবির আত্মবিশ্বাস দেখে সত্যিই সবাই বিস্মিত। প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে ১৭০০ ফুট উচ্চতায় পাথরের তৈরি ঝুলন্ত টাইগার্স নেস্ট থেকে নিচের অতিক্রান্ত পথ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম- কীভাবে এত ওপরে এই পাথরের মন্দির তৈরি করা সম্ভব হলো। মনে মনে এক রকমের ভয়েরও উদ্রেক হয়েছিল এটা ভেবে- কারুকার্যময় ঝুলন্ত মনাস্ট্রিটি যে কোনো সময় পাহাড়ের গা থেকে খুলে যেতে পারে। চারপাশের প্রকৃতিকেও বিমুগ্ধ নয়নে দেখছিলাম। অবশেষে মনাস্ট্রির প্রসাদ (দুধ মেশানো) খই খেয়ে ফটোসেশন শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালাম। সত্যিই শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধ্যে এই ঝুলন্ত তাকসান মনাস্ট্রি অন্যরকমের বিস্ময় উদ্রেক করে। এক ধরনের টানও কাজ করে খুব ভেতরে। কেবলই মনে হয় আবার আসতে হবে 'ভূ-উত্থান'- ভুটানের নির্জন নিস্তব্ধ এই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ফিরে পাওয়ার জন্য।

লেখক: গবেষক ও পরিবেশবিদ

ভ্রমণের প্রস্তুতি

সড়ক পথে ভুটান যেতে হলে আপনাকে প্রথমেই ভারতের ট্রানজিট ভিসা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে- ভিসার মেয়াদ কিন্তু ১৪ দিন। অর্থাৎ ভুটান যাওয়ার কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ দিন আগে আপনাকে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কের বেজমেন্ট ফ্লোরে ভারতীয় ভিসা সেন্টারে আবেদন করতে হবে।

ভিসা জমা দিতে যা লাগবে-

* অনলাইনে ফরম পূরণ করে তার প্রিন্ট কপি। ভিসা ফরম পূরণের সময় ভিসা টাইপ ট্রানজিট ও পোর্ট দেবেন বাই রোড চ্যাংড়াবান্ধা/জয়গাঁ।

* সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডযুক্ত দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি ছবি ফরমের সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

* ন্যাশনাল আইডি বা জন্মসনদের ফটোকপি।

* বর্তমান ঠিকানার সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বা গ্যাস বিলের শেষ ৬ মাসের কপি।

* চাকরিজীবীদের এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট), ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স ও শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডের ফটোকপি।

* ডলার এন্ড্রোসমেন্টের (২০০ ডলার) কপি অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্টের (১৫ হাজার টাকা থাকতে হবে) কপি।

* বর্তমানে ভুটানে হোটেল রিজার্ভেশনের কাগজও দেখতে চায় ভারতীয় হাইকমিশন। তাই ভুটানে যে হোটেল বুকিং দিয়েছেন, তার কাগজও জমা দিতে হবে।

* পাসপোর্ট ও পাসপোর্টের ফটোকপি (পাসপোর্টের মেয়াদ সর্বনিম্ন ছয় মাস থাকতে হবে)। আগে ইন্ডিয়ান ভিসা থাকলে সেটারও ফটোকপি লাগবে। পুরাতন পাসপোর্ট থাকলে সেটাও জমা দিতে হবে।

* বাসের টিকিটের ফটোকপিও জমা দিতে হবে অরজিনাল কপির সঙ্গে। এজন্য ভ্রমণ তারিখ ও হাইকমিশনে ভিসার আবেদন জমা দেয়ার তারিখের সঙ্গে ১০ থেকে ১২ দিন গ্যাপ রাখবেন। কারণ, আবেদন জমা দেয়ার ৮ থেকে ১০ দিন পর ভিসা দেয়া হয়।

কীভাবে যাবেন

ট্রানজিট ভিসা নিয়ে সোজা চলে যাবেন বুড়িমারী বর্ডারে। ঢাকা থেকে শ্যামলী, এসআর, মানিক আর নাবিলসহ বেশ কয়েকটি বাস ছাড়ে। রাত ৮ টার মধ্যে এসব বাস ঢাকা থেকে ছেড়ে যায়। পরদিন সকালে অর্থাৎ ভোরে পৌঁছে যাবেন বুড়িমারী। মনে রাখবেন, বাংলাদেশের এপাশের নাম বুড়িমারী আর ভারতের ওপাশের নাম চ্যাংড়াবান্ধা। আর বর্ডার খোলা হয় বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায়। বাংলাদেশের ইমিগ্রেশনের কাজ সেরে চ্যাংড়াবান্ধা যেতে হবে। সেখানেও রয়েছে বেশকিছু ফর্মালিটি। চ্যাংড়াবান্ধা থেকে আপনাকে যেতে হবে জয়গাঁ বর্ডার। চাইলে ট্যাক্সি অথবা বাসে যেতে পারেন। জয়গাঁ থেকে ভারতীয় ইমিগ্রেশন পয়েন্টে যেতে হবে। সেখানে ইমিগ্রেশনের কাজ সেরে হেঁটেই ঢুকতে হবে ভুটান। এটাই ভুটানের প্রবেশ পথ। জয়গাঁয়ের ওপারেই ফুন্টসলিং। এখানেই আপনাকে অন অ্যারাইভাল ভিসা দেবে ভুটান।

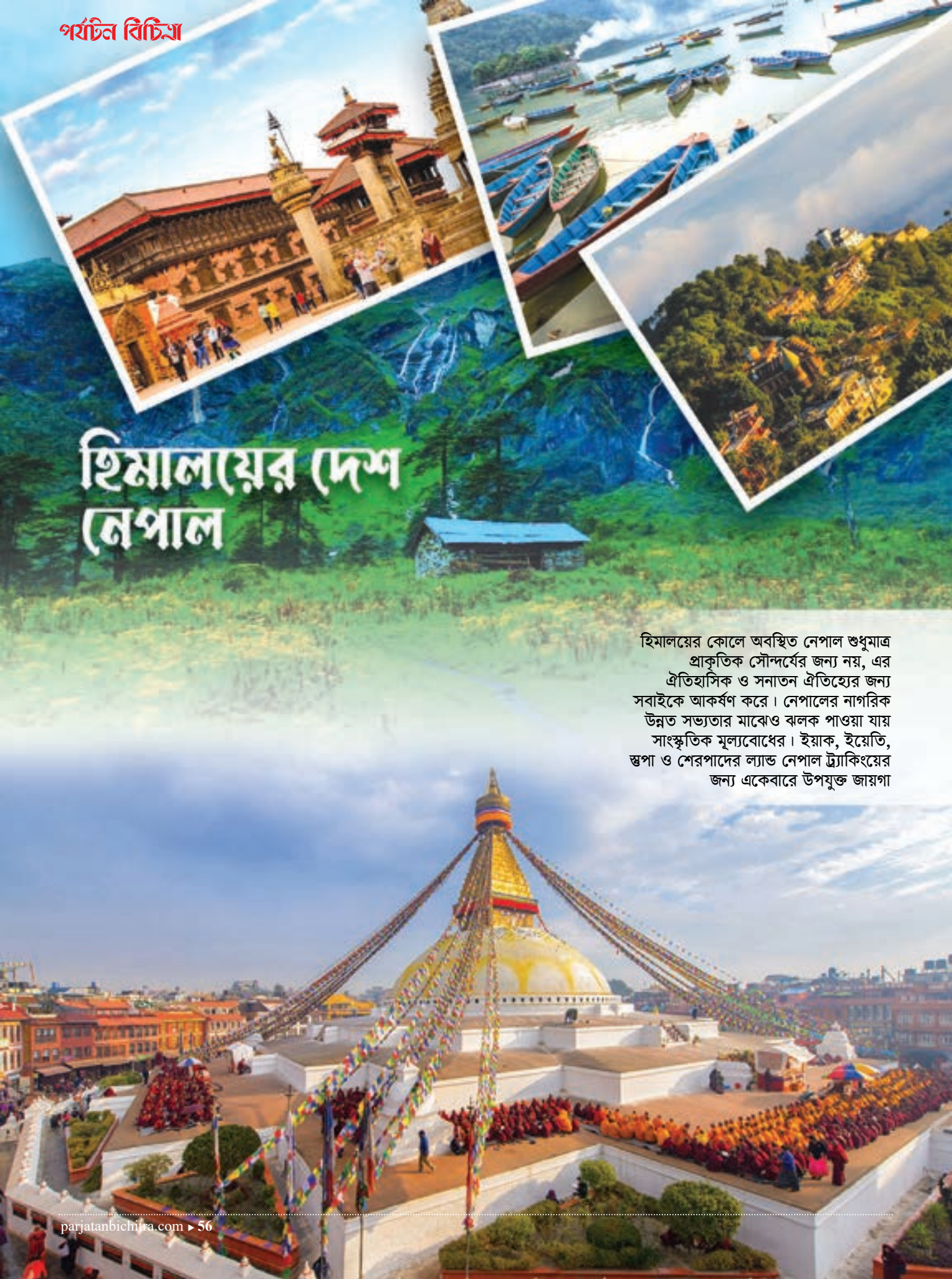

হিমালয়ের দেশ নেপাল

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত নেপাল শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, এর ঐতিহাসিক ও সনাতন ঐতিহ্যের জন্য সবাইকে আকর্ষণ করে। নেপালের নাগরিক উন্নত সভ্যতার মাঝেও ঝলক পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের। ইয়াক, ইয়েতি, স্তুপা ও শেরপাদের ল্যান্ড নেপাল ট্র্যাকিংয়ের জন্য একেবারে উপযুক্ত জায়গা

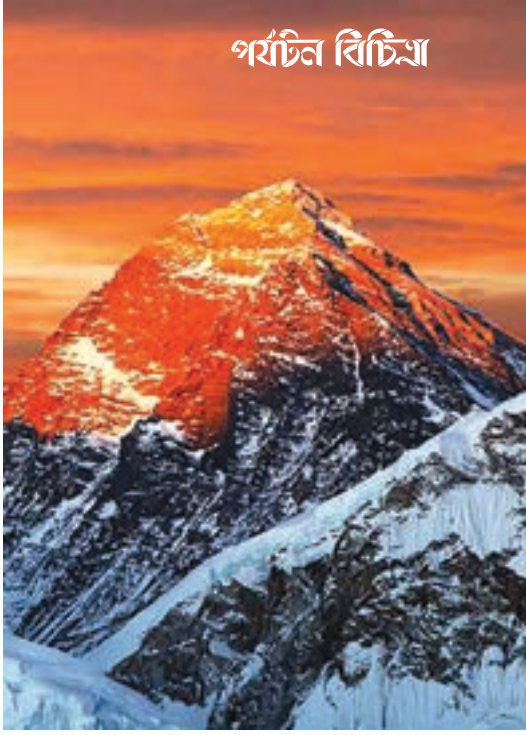

কাঠমান্ডু
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু এখানকার সব থেকে বড় শহর। কাঠমান্ডুর ইতিহাস প্রায় দুশো বছর পুরনো। 'খুকরি' ছুরির আকারের এই শহর নেপালের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রাণবন্ত এই শহরের অভিনব আতিথেয়তা আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

কী দেখবেন
ঘুরে দেখার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে নেপালে। ভালোভাবে দেখতে হলে সময় লাগবে। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের তথ্য ও বিবরণ দেয়া হলো।

হনুমান ধোকা (দরবার স্কয়ার)
এটি কাঠমান্ডু শহরের সামাজিক ও ধার্মিক কেন্দ্র। ১২শ থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে তৈরি মহল ও মন্দির দেখতে পাবেন এখানে। তলেজু টেম্পল, তাল ভৈরব, নওতলে দরবার, করোনোশন চক, রাজা প্রতাপ মল্লর মূর্তি, বিগ বেল ও বিগ ড্রাম এখানকার কিছু দর্শনীয় স্থান। কাঠমান্ডু থেকে ৭ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ৩৬ মিটার উঁচু।

বৌদ্ধনাথ স্তুপা
বৌদ্ধনাথ স্তুপা শিল্পের ব্যতিক্রম নিদর্শন। এখানে প্রায় ৪৫টি মনাস্ট্রি আছে।

বালাজু ওয়াটার গার্ডেন
নাগার্জুন হিলসের তলায় অবস্থিত এই বাগানে দেখতে পাবেন সি ড্রাগনের আকারে খচিত ২২টি স্টোন ওয়াটারস্প্রাউটস। পাশাপাশি ফিসপন্ড, বুধানীলকণ্ঠর মূর্তি এবং সমাধি এখানকার বাড়তি আকর্ষণ।

পশুপতিনাথ মন্দির
ভগবান শিবের সব থেকে পবিত্র মন্দির হিসেবে গণ্য পশুপতিনাথ মন্দির কাঠমান্ডুর গর্ব। ৪০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এই মন্দিরের আধুনিক এবং সনাতন স্থাপত্যশিল্প নিঃসন্দেহে আপনাকে অবাক করবে। এই মন্দির নেপালের বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতীক।

বুধানীলকণ্ঠ
একটি ছোট পুকুরের মধ্যে ভাসমান এই মূর্তি লিচ্ছবি সভ্যতা ভাস্কর্যের অদ্ভুত নিদর্শন। কালো পাথরে খোদাই করা এই বিশাল বিষ্ণুমূর্তি দুর্লভ এবং অত্যন্ত মূল্যবান।

পোখরা
পোখরাকে বলা হয় 'সিটি অব অ্যাডভেঞ্চারাস'। কাঠমান্ডুর ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত পোখরায় দেখতে পাবেন অন্যন্য লেক এবং উঁচু পর্বতমালা। শহরের কোলাহল থেকে দূরে যারা লেক সাইডে রিল্যাক্স করতে চান বা পাহাড়ে ট্র্যাকিংয়ের স্বাদ নিতে চান, পোখরায় চলে আসুন। লেক অঞ্চলেই পোখরার বেশির ভাগ হোটেল ও রেস্তোরাঁ খুঁজে পাবেন। আপনি বোটিংও করতে পারেন। পোখরায় দেখে নিন লেকের মধ্যে বারহী টেম্পল, ছোট পাহাড়ের ওপর ডেভিড ফলস। কাঠমান্ডু থেকে প্লেনে অথবা বাসে যেতে পারেন পোখরাতে।

চেকলিস্ট

নেপাল কীভাবে যাবেন
ঢাকা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও হিমালয়া এয়ারলাইন্সে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় কাঠমান্ডুতে। সময় লাগবে এক ঘণ্টা। কাঠমান্ডু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আপনি এয়ারে, ট্যাক্সি বা এসি বাসে পোখরা চলে যেতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিনই এসব বিমান ছেড়ে যাচ্ছে।

জেনে নিন
বাংলাদেশে নেপাল দূতাবাস
ইউনাইটেড নেশন, রোড-২, বারিধারা
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
টেলিফোন + ৮৮-০২-২২২২৯২৫৬৮, ২২২২৯২৪৯০
ইমেইল: eondhaka@dhaka.net, eondhaka@mofa.gov.np
ওয়েব: bd.nepalembassy.gov.np
অফিস সময় সূচি: রোববার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নেপাল দূতাবাস খোলা থাকে। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি।
নেপালে বাংলাদেশ দূতাবাস
বসুন্ধরা, ওয়ার্ড নং-৩, চক্রপাত,
কাঠমান্ডু, নেপাল।
টেলিফোন: +৯৭৭-১-৪৯৭০-১৩০/৪৯৭০-১৩১ (পিএবিএক্স)।
ইমেইল: mission.kathmandu@mofa.gov.bd

কোথায় থাকবেন
আন্তর্জাতিক মানের হোটেল থেকে শুরু করে কমফোর্টেবল লজ এবং গেস্ট হাউজ পেয়ে যাবেন কাঠমান্ডুতে। থামেলকে কাঠমান্ডুর হোটেল কোয়ার্টার বলা যেতে পারে।

খাওয়া-দাওয়া
ট্র্যাডিশনাল নেপালিজ ফেস্টিভাল ক্যুইজিন, ইতালিয়ান, ভারতীয়, চাইনিজ ও থাই খাবার খেতে পারেন। তবে অবশ্যই ট্রাই করবেন নেওয়ারি ক্যুইজিন।

কেনাকাটা
শপিংয়ের জন্য কাঠমান্ডু একেবারে আদর্শ জায়গা। ট্র্যাডিশনাল স্যুভেনির থেকে কন্টেম্পোরারি হ্যান্ডিক্রাফটস সব পেয়ে যাবেন কাঠমান্ডুতে। খুকরি ছুরি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, গ্লাস বিডস, মৈথিলী পেন্টিং, সেন্টেড ক্যান্ডেলস এখানকার বিশেষত্ব।

কখন যাবেন
নেপালে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো মার্চ-এপ্রিল অথবা অক্টোবর-নভেম্বর। এ সময় অল্প গরম থাকে এবং ভালোভাবে পাহাড় উপভোগ করা যায়।

নেপালে প্যাকেজ ট্যুর
নেপালে বেড়ানোর জন্য রয়েছে দুই ধরনের প্যাকেজ ট্যুর। সড়কপথে ভারতের দার্জিলিংসহ নেপাল, আর আকাশপথে নেপাল। ঢাকা থেকে নেপালের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করছে অনেক ট্যুর অপারেটর। এর মধ্যে রয়েছে- রিভার অ্যান্ড গ্রিন ট্যুরস, (ফোন: +৮৮০১৮১৯২২৪৫৯৩), মাউন্টেন ক্লাব ট্যুরস (ফোন: +৮৮০১৯৫৬৫৫৫৯৯৯), নিউ ডিসকভারি (ফোন: +৮৮০১৭১৪১০৯৬১১), গ্রিন হলিডেজ (ফোন: +৮৮০১৭৩০৪৫০০৯৯), বাংলাদেশ ভ্যাকেশন (ফোন: +৮৮০১৭৪৪৬২৯৪২৯), ট্রিপ মেকার (ফোন: +৮৮০১৭১১৫২১২৩৯)।

নেপালে পাহাড়ে ট্র্যাকিং করছেন কয়েকজন পর্যটক

দ্বিচক্রযানে রুয়ান্ডায়

আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল

সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ কোনটি? বলতে পারবেন? দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে ছোট দেশ। নাম তার রুয়ান্ডা। প্রতিবেশী বুরুন্ডির থেকেও ছোট এবং তানজানিয়া, উগান্ডা ও কঙ্গোর তুলনায় বামন রাষ্ট্র। দেশটি ১০ হাজার ১৬৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ কোটি সাড়ে ৩৬ লাখ হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তালিকায় বিশ্বের নবম নিরাপদ দেশ এটি। গেল জুনে দেশটিতে সাইকেল চালানোর সুযোগ ঘটেছিল। আমরা চারজন গিয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে। রুয়ান্ডাতে ২০ দিন ছিলাম। এর মধ্যে একটানা ১৩ দিন সাইকেল চালিয়েছি।

রুয়ান্ডাতে আমাদের পোর্ট অব এন্ট্রি ভিসা। কোনো ফি দিতে হয়নি, তবে ইমিগ্রেশনের পর করোনার টেস্ট করাতে হয়েছে সবাইকে। পূর্ব নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এটি একটি চার্চের হোটেল। হোটেলের ম্যানেজার মার্টিন বয়সে তরুণ এবং চমৎকার ইংরেজি বলেন। কিনিয়ারোয়ান্ডা হলো রুয়ান্ডার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ভাষা। ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় অনেকে কথা বলেন এবং মাইগ্রেশেনের কারণে সোয়াহিলি ভাষার প্রচলনও রয়েছে। St. Etienne Guest House-টি পাহাড়ের চূড়ায়। তাদের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট রয়েছে। রাতের খাবারের জন্য ডিম ভাজি, মুরগি ও পালংশাকের মতন যাকে তারা বলে ডডু (dodo) এবং পরবর্তীতে প্রায় প্রতিদিনই ডডু খাওয়া হতো।

ঢাকায় ব্র্যাকে কর্মরত শরীফুল হাসানের সহযোগিতায় রুয়ান্ডায় ব্র্যাকে কর্মরত বেশ কয়েক জনের সঙ্গে কথা হয়। এদের মধ্যে বেলায়েত ভাই, মুজাম ভাই, রাজীব দে অন্যতম। কেনিয়াতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাইকমিশনার তারেক মুহাম্মদ, সায়েম আহামদ ও প্রটোকল অফিসার নাসির ভাইয়ের সহযোগিতা অতুলনীয়। ঢাকাতে রুয়ান্ডার অনারারি কনসাল ইকবাল ভাই, নতুন দিল্লিতে রুয়ান্ডার হাইকমিশন, কিগালিতে RDB (Rwanda Development Board), সাইক্লিস্ট ক্যালিসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

রুয়ান্ডাকে বলা হয় হাজার পাহাড়ের দেশ। দেশটিতে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ। এটি একটি স্থলবেষ্টিত (Landlock) দেশ। প্রতিদিনই কফি খাওয়া হতো। এখানকার কফি বিখ্যাত। রুয়ান্ডার কফি ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, নিকারাগুয়া এবং কোস্টারিকার পাশাপাশি রয়েছে। কোনো দেশের নেতা বা শাসক যদি সৎ বা ভালো হন, তবে সে দেশের জন্য সুবাতাস বয়ে আনে। রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে তেমনি একজন সফল সমরনায়ক ও প্রেসিডেন্ট। তিনি রুয়ান্ডার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট, ২০০০ সাল থেকে বহাল তবিয়তে আছেন। দেশটি এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পেছনে রয়েছে রুয়ান্ডাবাসীর কমিউনিটি কার্যক্রম; যা উমাগান্ডা (Umuganda) নামে পরিচিত। এই ধরনের সেবা কার্যক্রম প্রতি মাসের শেষ শনিবার পালন করা হয়। যেখানে তারা কমিউনিটি সেক্টরের মধ্যে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে বৃক্ষ রোপন এবং কৃষিকাজ পর্যন্ত বিভিন্ন পাবলিক ওয়ার্ক প্রকল্পে কাজ করে থাকেন। এই বিষয়টি আমরা রুয়ান্ডার সর্বত্র দেখেছি। একদিন জমিতে একদল লোককে দেখলাম সবাই কমলা রঙের কাপড় পরে কাজ করছেন। পরে জানলাম এরা সবাই কয়েদি ছিলেন।

যদিও রাস্তাঘাটে সর্বত্র নারীদেরই কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য দেখেছি। এমনকি দেশটির পার্লামেন্টে ৬০ ভাগের বেশি সদস্য নারী; যা বিশ্বের আর কোনো দেশের পার্লামেন্টে নেই।

সাইক্লিস্ট ক্যালি তার বাবা-মাকে রুয়ান্ডায় গণহত্যার সময় হারিয়েছেন। গণহত্যার বিষয়ে

কোনো দেশের নেতা বা শাসক যদি সৎ বা ভালো হন, তবে সে দেশের জন্য সুবাতাস বয়ে আনে। রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে তেমনি একজন সফল সমরনায়ক ও প্রেসিডেন্ট। তিনি রুয়ান্ডার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট, ২০০০ সাল থেকে বহাল তবিয়তে আছেন। দেশটি এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পেছনে রয়েছে রুয়ান্ডাবাসীর কমিউনিটি কার্যক্রম; যা উমাগান্ডা (Umuganda) নামে পরিচিত। এই ধরনের সেবা কার্যক্রম প্রতি মাসের শেষ শনিবার পালন করা হয়

তারা কথা বলতে আগ্রহী নন। সবকিছু ভুলে তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। যারা জানেন না, তাদের জন্য বলছি- রুয়ান্ডার জনসংখ্যার বেশিরভাগই হুতু ও তুতসি। এই দুটি জাতিগত গোষ্ঠী প্রায়ই ঐতিহাসিকভাবে সংঘাতের মধ্যে রয়েছে। এই সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল ১৯৯৪ সালে, যখন মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে প্রায় এক মিলিয়ন তুতসি এবং মধ্যপন্থী হুতুকে হত্যা করেছিল হুতুরা। এটি ইতিহাসের সবচয়ে দ্রুততম এবং সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যার মধ্যে একটি। আজ রুয়ান্ডা একটি খুব ভালো অবকাঠামোসহ একটি আধুনিক দেশ হিসেবে পরিচিত। রুয়ান্ডাকে হাজার পাহাড়ের দেশ বলা হয়, কখনো কখনো আফ্রিকার 'সুইজারল্যান্ড' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। রুয়ান্ডায় ছুটির দিনে যে সব জায়গায় ঘুরে আসতে পারেন সেগুলো হলো- পর্বত গরিলা, চা বাগান, লেক কিভু, আফ্রিকার প্রাচীনতম রেইনফরেস্টের মধ্য দিয়ে হাইকিং করা। রাস্তা খুব ভালো হওয়ায় খুব অল্প সময়েই রুয়ান্ডার সর্বত্রই যাওয়া যায়। কিগালি, নিয়ং ওয়ে ন্যাশনাল পার্ক, লেক কিভু এবং বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি জাতীয় উদ্যান ঘোরা ছাড়া রুয়ান্ডা ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। আর আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি সাইকেলে করে, আমাদের আনন্দ ছিল অন্য সবার চেয়ে আলাদা। রুয়ান্ডা এক ভালোবাসা ও ভালো লাগার নাম। দ্বিতীয় দিন ব্র্যাকের রাজিব, ইমরানের ভারতীয় দুজন সাইক্লিস্ট বন্ধু ও আরডিবি থেকে সাইক্লিস্ট ক্যালি আসলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। পরবর্তীতে রাজীব, ক্যালিসহ পদব্রজে কিগালির লোকাল মোবাইল সিমকার্ড ও ডলার ভাঙানোর জন্য কিগালি সিটি মলে যাই। পথে চোখে পড়ে কার ফ্রি জোন এবং বসার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান। যেখানে বসে ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহার করছেন অনেকে। কেউ ছবি তোলায় ব্যস্ত, সিনেমা/নাটকের শুটিংও দেখলাম। কিগালি সাইন রয়েছে এমনভাবে, যেখানে পর্যটকরা এসে সবাই ছবি তুলতে পারেন। রাস্তার পাশে প্রচুর সুভ্যেনির ব্যবসার দোকান, একটি পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টও দেখলাম।

এই সিটি মলের পাশেই হাঁটার দূরত্বেই রয়েছে হোটেল দেস মিল কোলাইনস (Hôtel des Mille Collines)। এটি সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। হোটেলটি রুয়ান্ডার গণহত্যার সময় ১ হাজার ২৬৮ জন মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। তারা সংখ্যাহীন কক্ষে ১০ জনের দলে লুকিয়ে থাকতেন এবং পানীয় জলের জন্য সুইমিংপুলের পানির ওপর নির্ভর করতেন। ২০০৪ সালের কাল্পনিক চলচ্চিত্র হোটেল রুয়ান্ডা (Hotel Rwanda) থেকে পর্যটকরা ইতোমধ্যেই কিছুটা পরিচিত। এটি এখনো কার্যকর বিলাসবহুল হোটেল। এটি এখন কিগালিতে থাকার সেরা জায়গাগুলোর অন্যতম। এটি একটি চার তারকা হোটেল, এখানে ১১২টি রুম রয়েছে। হোটেলের রিসেপশন থেকে শুরু করে সর্বত্র রুয়ান্ডার আর্ট কালচারের ছোঁয়া রয়েছে। কিগালির অপূর্ব দৃশ্য দেখতে হলে হোটেলটির চতুর্থ তলায় (Le Panorama) রেস্টুরেন্টে যেতে হবে।

১৯৬২ সাল থেকেই কিগালি রুয়ান্ডার রাজধানী ছিল, যখন রুয়ান্ডা বেলজিয়াম থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে যখন যাই, তখন সে দেশের কিছু সুভ্যেনির সংগ্রহ করি। কিগালির সুভ্যেনিরের জন্য ক্যাপলাকি মার্কেট খুব বিখ্যাত। তবে দাম অন্য জায়গার চেয়ে বেশি। কার ফ্রি জোনে সুভ্যেনিরের দাম অনেক কম এবং সবচেয়ে ভালো পেয়েছিলাম আমাদের গেস্ট হাউজের অপরদিকে একটি ছোট সুভ্যেনির শপে।

লেখক: প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন

পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে পরিচিত রুয়ান্ডার সমুদ্র সৈকতে দৌড়াচ্ছে এক কিশোর

বিশ্ব পর্যটন দিবস

পর্যটনে নতুন ভাবনা

টেকসই উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা

মো. জিয়াউল হক হাওলাদার

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনডব্লিউটিও) এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য হলো- 'Rethinking Tourism' বা 'পর্যটনে নতুন ভাবনা'। পর্যটন শিল্পের তথাকথিত উন্নয়নের ধারা থেকে বের হয়ে নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ এর উদ্দেশ্য। এই বছরের প্রতিপাদ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা যেভাবে পর্যটন উন্নয়ন করছি তা নতুন করে ভাবনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

মহামারি কোভিড-১৯ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পেরও সব ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই মহামারি আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, কীভাবে সব প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা করা যায়। কীভাবে পর্যটন শিল্পে জড়িত স্থানীয় সব মানুষের সর্বোচ্চ সুবিধা ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সব নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে কোভিডের আগে-পরের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এই শিল্পের পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং এর নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের পর্যটন শিল্পে আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে। পর্যটন শিল্প ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি ও সরকারের অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা যেমন- '২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ', '২০৭৫ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' এবং '২১০০ সালে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন' ইত্যাদি অর্জিত হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন ও পর্যটন শিল্পে ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে দ্রুত এবং টেকসই উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সেতু চালুর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে এক নতুন উদ্যোম শুরু হয়েছে। বিশ্বের ১১তম বৃহৎ পদ্মা বহুমুখী সেতু দেশের উন্নয়নের এক অপার বিস্ময়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, মানবতার জননী, উন্নয়নের কাণ্ডারি দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি উপহার পেয়েছে এই পদ্মা সেতু। আর এই সেতু পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদ্মা সেতুর কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে।

সুতরাং এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নও অনিবার্যভাবে হচ্ছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সহজেই নিজস্ব গাড়ি বা গণপরিবহণে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে পদ্মা সেতু হয়ে সুন্দরবন ও কুয়াকাটায় যেতে পারছেন।

বিদেশি পর্যটকরা বেনাপোল ও ভোমরা বন্দর দিয়ে সাতক্ষীরা হয়ে কুয়াকাটা, সুন্দরবন দেখে রাজধানী ঢাকা হয়ে উত্তরাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসমূহ অবলোকন করতে পারবেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান প্রায় ৪ শতাংশ। পদ্মা সেতুর ফলে আগামী ১০ বছরে দেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, স্থানীয় জনগণের আয় বাড়বে এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধিত হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৩ লাখ লোক জড়িত। এই সংখ্যা আগামী দিনগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে। পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আরও বাড়বে। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও খাদ্য শিল্পের উন্নয়ন হবে। উন্নয়ন হবে হস্ত শিল্পের। আমরা জানি, একটি দেশের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সর্বমোট ১০৯টি সেক্টর জড়িত।

সুতরাং পদ্মা সেতু হওয়ার পর এসব খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ঘোষিত এবারের প্রতিপাদ্যে পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পে স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের প্রচলিত পর্যটন আকর্ষণের উন্নয়ন ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রতিপাদ্যটির যথাযথ প্রচার দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে পর্যটনমনস্ক হতে উৎসাহিত করবে।

লেখক: ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

রহস্যেঘেরা বান্দরবানের বগালেক

টাঙ্গুয়ার হাওড়ের অপরূপ দৃশ্য

Why fly Biman...

State-of-the-art Aircraft

Skilled Maintenance

Well-trained & Experienced Crew-members

These three make us Unique

Biman Bangladesh Airlines
Where Safety is never compromised

Biman
BANGLADESH AIRLINES
Your home in the sky
www.biman-airlines.com

Desert express

www.desertexpress.ae.com

TRAVEL WITH US UAE

BOOK YOUR TRAVEL NOW

Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition

Sightseeing | Transport

Corporate Event

Corporate Training | Documentary | Guide & logistics

Education / Medical / Migration Consultancy

BANGLADESH House: 97/1, Flat: 2B, Sukrabad, Dhaka-1207 +880 1708 427788, +880 1730 450099 desertexpress20@gmail.com